প্রবন্ধ

সাহিত্যের পথে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2021

সূচিপত্র

- উৎসর্গ....3
- বাস্তব....7
- কবির কৈফিয়ত....18
- সাহিত্য....27
- তথ্য ও সত্য....36
- সৃষ্টি....49
- সাহিত্যধর্ম....60
- সাহিত্যে নবত্ব....70
- সাহিত্যবিচার....77
- আধুনিক কাব্য....85
- সাহিত্যতত্ত্ব....103
- সাহিত্যের তাৎপর্য....124
- কবির অভিভাষণ....141
- পঞ্চাশোর্ধ্বম্‌....149
- বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ....159
- সভাপতির অভিভাষণ....169

- সভাপতির শেষ বক্তব্য 183
- সাহিত্যরূপ 188
- সাহিত্যসমালোচনা 201
- সাহিত্যসম্মিলন 213

উৎসর্গ

কল্যাণীয়
শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে
শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

রসসাহিত্যের রহস্য অনেক কাল থেকেই আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি, ভিন্ন ভিন্ন তারিখের এই লেখাগুলি থেকে তার পরিচয় পাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বার বার নানারকম করে বলেছি। সেটা এই বইয়ের ভূমিকায় জানিয়ে রাখি।

মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে, আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।

ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমন-কি, সেই অদ্ভুতের সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানা ভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত; রূপকথার উদ্ভব তারই থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানাখানা; রামও হয়, হনুমানও হয়, ঠিকমত হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের

আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে, অসুন্দরও আছে।

একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু, এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না – সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেল না।

তখন মনে এল, এতদিন যা উলটো করে বলেছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না-বলি তাতে কিছু আসে-যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্যে দেয়, নইলে “ওথেলো’ নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে উদ্‌বেজিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্যের কোঠায় গণ্য করি।

মনে উত্তর এল, চারি দিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারি দিকে এমন-কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্‌বোধিত করে রাখে, তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় করে পাই। এইটের অভাব অবসাদ। বস্তুত, মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা; ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্‌। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে; লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীট্‌সের বাণী মনে পড়ল : ঝক্ষয়ঢ়ব ভড় থনতয়ঢ়ঁ, থনতয়ঢ়ঁ ঢ়ক্ষয়ঢ়ব। অর্থাৎ, যে সত্যকে আমরা “হৃদা মনীষা মনসা’ উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে, সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ, তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্য থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে ক্ষনতরসাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে “এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম’, জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের সীলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয় – সে অসুন্দর হলেও মনোরম; সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।

সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।

কিন্তু, এর মধ্যে মূল্যভেদের কথা আছে, কেননা এ তো বিজ্ঞান নয়। সকল উপলব্ধিরই নির্বিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দসম্ভোগে মানুষের নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে। মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাতলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু, আনন্দ-সম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব-ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু, মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়।

শান্তিনিকেতন, ৮আশ্বিন ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাস্তব

লোকেরা কিছুই ঠিকমত করিতেছে না, সংসারে যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হইতেছে না, সময় খারাপ পড়িয়াছে – এই-সমস্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া মানুষ দিব্য আরামে থাকে, তাহার আহারনিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, এটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। দুশ্চিন্তা-আগুনটা শীতের আগুনের মতো উপাদেয়, যদি সেটা পাশে থাকে কিন্তু নিজের গায়ে না লাগে।

অতএব, যদি এমন কথা কেহ বলিত যে, আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না, তবে খুব সম্ভব, আমিও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্‌বেগ প্রকাশ করিয়া বলিতাম, কথাটা ঠিক বটে; এবং নিজেকে এই দলের বাহিরে ফেলিতাম।

কিন্তু, একেবারে আমারই নাম ধরিয়া এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অন্যের তাহাতে যতই আমোদ হোক, আমি সে আমোদে খোলা মনে যোগ দিতে পারি না।

তবে কিনা, বাসরঘরে বর এবং পাঠকসভায় লেখকের প্রায় একই দশা। কর্ণমূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়। সহ্য যে করে তাহার কারণ এই, একটা জায়গায় তাহাদের জিত আছে। যে যতই উৎপীড়ণ করুক, যে বর তাহার কনেটিকে কেহ হরণ করিবে না; এবং যে লেখক তাহার লেখাটা তো রইলই।

অতএব, নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু, এই অবকাশে সাধারণভাবে সাহিত্য-সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেননা, যদিচ প্রথম নম্বরেই আমার লেখাটাকেই সেসনে সোপরদ্দ করা হইয়াছে তবু এ খবরটারও আভাস আছে যে, আজকালকার প্রায় সকল লেখকেরই এই একই অপরাধ।

বাস্তবতা না থাকা অবশ্যই একটা মস্ত ফাঁকি। বস্তু কিছুই পাইল না অথচ দাম দিল এবং খুশি হইয়া হাসিতে হাসিতে গেল, এমন-সব হতবুদ্ধি লোকের জন্য পাকা অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া উচিত। সেই লোকেই অভিভাবকের উপযুক্ত, কবিরা ফস্ করিয়া যাহাদিগকে কলাকৌশলে ঠকাইতে না পারে, কটাক্ষে যাহারা বুঝিতে পারে বস্তু কোথায় আছে এবং কোথায় নাই। অতএব, যাঁহারা অবাস্তব-সাহিত্য সম্বন্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা নাবালক ও নালায়েক পাঠকদের জন্য কোর্ট্ অফ ওয়ার্ড্স্ খুলিবার কাজ করিতেছেন।

কিন্তু, সমালোচক যত বড়ো বিচক্ষণ হোন-না কেন চিরকালই তাঁহারা পাঠকদের কোলে তুলিয়া সামলাইবেন সেটা তো ধাত্রী এবং ধৃত কাহারো পক্ষে ভালো নয়। পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া দেওয়া উচিত কোন্‌টা বস্তু এবং কোন্‌টা বস্তু নয়।

মুশকিল এই যে, বস্তু একটা নহে এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করি না। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তাহার আয়োজন নানা এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে হয়।

এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুজি। ওস্তাদেরা বলিয়া থাকেন, সেটা রসবস্তু। বলা বাহুল্য, এখানে রসসাহিত্যের কথাই হইতেছে। এই রসটা এমন জিনিস যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও কোনো মীমাংসা হয় না।

রস জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন, কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর-সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।

সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, ‘আমিই সেই রসিক।’ প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না, কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে, সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল এবং আমার কোন্‌টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চূড়ান্ত মীমাংসা, পনেরো-আনা লোক সে সম্বন্ধে নিঃসংশয়। এইজন্যই সাহিত্যসমালোচনায় বিনয় নাই। মূলধন না থাকিলেও দালালির কাজে নামিতে কাহারো বাধে না, তেমনি সাহিত্যসমালোচনায় কোনোপ্রকার পুঁজির জন্য কেহ সবুর করে না। কেননা সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সাহিত্যের যাচাই-ব্যাপারটা এতই যদি অনিশ্চিত, তবে সাহিত্য যাহারা রচনা করে তাহাদের উপায় কী। আশু উপায় দেখি না। অর্থাৎ, তাহারা যদি নিশ্চিত ফল জানিতে চায় তবে সেই জানিবার বরাত তাহাদের প্রপৌত্রের উপর দিতে হয়। নগদ-বিদায় যেটা তাহাদের ভাগ্যে জোটে সেটার উপর অত্যন্ত ভর দেওয়া চলিবে না।

রসবিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বহু ব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্য পদার্থটিকে বহিয়া লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে।

কোনো কবির রচনার মধ্যে সাহিত্যবস্তুটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজদার কবির সমসাময়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবি করিলে ঠকা অসম্ভব নয়।

এমন অবস্থায় লেখকের একটা সুবিধা আছে এই যে, তাঁহার লেখা যে-লোক পছন্দ করে সেই যে সমজদার তাহা ধরিয়া লইতে বাধা নাই। অপর পক্ষকে তিনি যদি উপযুক্ত বলিয়া গণ্যই না করেন তবে এমন বিচারালয় হাতের কাছে নাই যেখানে তাহারা নালিশ রুজু করিতে পারে। অবশ্য, কালের আদালতে ইহার বিচার চলিতেছে, কিন্তু সেই দেওয়ানি আদালতের মতো দীর্ঘসূত্রী আদালত ইংরেজের মুল্লুকেও নাই। এ স্থলে কবিরই

জিত রহিল, কেননা আপাতত দখল যে তাহারই। কালের পেয়াদা যেদিন তাহার খ্যাতি-সীমানার খুঁটি উপড়াইতে আসিবে সেদিন সমালোচক সেই তামাশা দেখিবার জন্য সবুর করিতে পারিবে না।

যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার তল্লাস করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার কথার উত্তরে বলিবেন, ‘দাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিসটার বস্তু পরিমাণ করা যায় না, এ কথা সত্য, কিন্তু রস-পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তো প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।জ্ঞদাঁড়িপাল্লায় চড়াইয়া রস-জিনিসটার বস্তু পরিমাণ করা যায় না, এ কথা সত্য, কিন্তু রস- পদার্থ কোনো একটা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তো প্রকাশ পায়। সেইখানেই আমরা বাস্তবতার বিচার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি।’

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাঠির আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেইটেরই বস্তুপিণ্ড ওজন করিয়া কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়।

রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে-রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু, বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।

আচ্ছা, মনে করা যাক, কবিতাকে বাস্তব করিবার লোভ আমি আর সামলাইতে পারিতেছি না। খুঁজিতে লাগিলাম, দেশে সবচেয়ে কোন্ ব্যাপারটা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম, ব্রাহ্মণসভাটা দেশের মধ্যে রেলোয়ে-সিগ্নালের স্তম্ভটার মতো চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আপনার একটিমাত্র পায়ে ভর দিয়া খুব উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কায়স্থেরা পৈতা লইবেই আর ব্রাহ্মণসভা তাহার পৈতা কাড়িবে, এই ঘটনাটা বাংলাদেশে বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো। অতএব, বাঙালি কবি যদি ইহাকে তাহার রচনায় আমল না দেয় তবে বুঝিতে হইবে, বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার বোধশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এই বুঝিয়া লিখিলাম

পৈতাসংহার-কাব্য। তাহার বস্তুপিণ্ডটা ওজনে কম হইল না, কিন্তু হায় রে, সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন না পদ্মের উপরে?

এই দৃষ্টান্তটি দিবার একটু হেতু আছে। বিচারকদের মতে, বাস্তবতা জিনিসটা কী তাহার একটা সূত্র ধরিতে পারিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে একজন ফরিয়াদি বলিয়াছেন, আমার সমস্ত রচনার মধ্যে বাস্তবতার উপকরণ একটু যেখানে জমা হইয়াছে সে কেবল ‘গোরা’ উপন্যাসে।

গোরা উপন্যাসে কী বস্তু আছে না-আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক তাহা সবচেয়ে কম বোঝে। লোকমুখে শুনিয়াছি, প্রচলিত হিঁদুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা হইতে আন্দাজ করিতেছি, ওটাই একটা বাস্তবতার লক্ষণ।

বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ংকর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বেশ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্ব-রচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর-কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি। সাহিত্যের বাস্তবতা ওজনের সময়ে এই বুলিটা হয় বাটখারা। কালিদাশকে আমরা ভালো বলি, কেননা তাঁহার কাব্যে হিন্দুত্ব আছে। বঙ্কিমকে আমরা ভালো বলি, কেননা স্বামীর প্রতি হিন্দুরমণীর যেরূপ মনোভাব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তাহা তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে দেখা যায়; অথবা নিন্দা করি, সেটা যথেষ্ট পরিমাণে নাই বলিয়া।

অন্য দেশেও এমন ঘটে। ইংলণ্ডে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের জ্বরোত্তাপ যখন ঘন্টায় ঘন্টায় চড়িয়া উঠিতেছিল তখন একদল ইংরেজ কবির কাব্যে তাহারই রক্তবর্ণ বাস্তবতা প্রলাপ বকিতেছিল।

তাহার সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় তবে ওয়ার্ড্স্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়। তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষা-অভ্যাস-আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়। তাঁহার ভাবের রাগিনীটি নির্জনবাসী একলা-কবির চিত্তবাঁশিতে বাজিয়াছিল – ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজনদরে যাহা বিক্রি হয় এমনতরো বস্তুপিণ্ড তাহার মধ্যে কী আছে জানিতে চাই।

আর, কীট্স্, শেলী – ইঁহাদের কাব্যের বাস্তবতা কী দিয়া নির্ধারণ করিব। ইংরেজের জাতীয় চিত্তের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কি ইঁহারা বকশিশ ও বাহবা পাইয়াছিলেন। যে-সমস্ত সমালোচক সাহিত্যের হাটে বাস্তবতার দালালি করিয়া থাকেন তাঁহারা ওয়ার্ড্স্বার্থের কবিতার কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে আছে। শেলিকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মতো তাঁহার দেশ সেদিন ঘরে ঢুকিতে দেয় নাই এবং কীট্স্কে মৃত্যুবাণ মারিয়াছিল।

আরো আধুনিক দৃষ্টান্ত টেনিসন। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত লোকধর্মের কবি। তাই তাঁহার প্রভাব দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী ছিল। কিন্তু, ভিক্টোরীয় যুগের বাস্তবতা যত ক্ষীণ হইতেছে টেনিসনের আসনও তত সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার কাব্যে যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্যরসের গুণে, তাহাতে ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ বস্তু বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া নহে – সেই স্থুল বস্তুটাই প্রতিদিন ধসিয়া পড়িতেছে।

আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির পক্ষে বাস্তব নহে, অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেইজন্যই এখনকার সাহিত্য দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

উত্তম কথা। কিন্তু, দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা তো নগণ্য। কেহ তাহাদের তো কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল

আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।

হয়তো উত্তরে শুনিব,আমরা হারিতেছি। ইংরেজি যাহারা শেখে নাই তাহারাই দেশের বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, তাহাই টিঁকিবে এবং তাহাতেই লোকশিক্ষা হইবে।

তাই যদি হয় তবে আর ভাবনা কিসের। বাস্তব-সাহিত্যের বিপুল ক্ষেত্র ও আয়োজন দেশ জুড়িয়া রহিয়াছে; তাহার মধ্যে ছিটাফোঁটা অবাস্তব মুহূর্তকালও টিঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু, সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।

অথচ, এ দিকে ইংরেজি-পোড়োরা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিল,রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও, সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই-যে কোনো কোনো মানুষ খামকা রাগিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কারণ, এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব। দেখ নাই কি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজরা কথায় কথায় বলিয়া থাকে, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি জাতটা গণ্যই নহে? তাহাদের কথার ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায়, তাহারা বাঙালিকেই বিশেষভাবে গণ্য করিয়াছে, কোনোমতেই ভুলিতে পারিতেছে না।

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে; সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই বাস্তবকে যে-লোক ভয় করে, যে-লোক বাঁধা নিয়মের শিকলটাকেই শ্রেয় বলিয়া জানে, তাহারা ইংরেজই হউক আর বাঙালিই হউক, এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতে থাকে। তাহাদের বাঁধা তর্ক এই যে, এক দেশের আঘাত আর-এক দেশকে

সচেতন করে না। কিন্তু, দূর দেশের দক্ষিণে হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক, জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া উঠে, মানবচিত্ততত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু, লোকশিক্ষার কী হইবে।

সে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের নহে।

লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দেবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে দুঃখী-কাঙালের ঘরকরনার কথা বর্ণিত। তাহাতে বড়ো বড়ো রাজা, বড়ো বড়ো রাক্ষস, বড়ো বড়ো বীর এবং বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো লেজের কথাই আছে। আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।

সাধারণ লোক মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিঙ্‌নাগাচার্য এই-কঞ্চটা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়াছিলেন। মেঘদূতের তো কথাই নাই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তববাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিজনোচিত কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন – কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

আমি অকবিজনোচিত এইজন্য বলিতেছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটাইয়া থাকেন, কেননা তাঁহারা বিশ্বের মিত্র, তাঁহারা ন্যায়ের অধ্যাপক নহেন। শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়িলেই সেটা বুঝিতে বাকি থাকিবে না।

কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তাহা সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল – আজকের সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিল না কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো তাহা বুঝিবে, অন্তত সেইরূপ আশা করি। কিন্তু, কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন – তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলা শতাব্দীর কী দশা হইত।

তুমি কি মনে কর, লোকহিতৈষী তখন কেহ ছিল না। লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি কী করিয়া হইতে পারে, সে কথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনো বই লেখে নাই। কিন্তু, সে কি সাহিত্য। ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই বৎসর-অন্তর ইস্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশা হইয়াছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চর ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা।

যাহা ভালো তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতেই হইবে – রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার ছেলের সুবিধা এই যে, তাহার সাধনা করিবার সময় আছে, কৃষাণের ছেলের নাই। কিন্তু, সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক – যদি প্রতিকার করিতে পার, করিয়া দাও, কাহারো আপত্তি হইবে না। তানসেন তাই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মতলবে সে আর কিছু হইতে পারেই না। যাহারা রসপিপাসু তাহারা যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়া সেই ধ্রুপদগুলির নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অবশ্য, লোক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব, এ কথা মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কোথায় কোন্ বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, কে তাহার খোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা তো নিজের খেয়ালমত এক কথায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না।

তবে কবিদের অবলম্বনটা কি। একটা-কিছুর ’পরে জোর করিয়া তাঁহারা তো ভর দিয়াছেন। নিশ্চয়ই দিয়াছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর। পূর্বেই বলিয়াছি, বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে – সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাশ, নানা কালের নানা ফ্যাশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই ’পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাস্টারির আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্বচনীয়। কবি জানেন, যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারো কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারো কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা; যে-লোক চোখ বুজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা এও তেমনি মিথ্যা। কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে-প্রমাণ, তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি সকলের নাই – সুতরাং বিচারকের আসনে যে-খুশি বসিয়া যেমন-খুশি রায় দিতে পারেন, কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই।

কবির আত্মানুভূতির যে-উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তাহা নানা কারণে কখনো আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মূল্যের প্রলোভনে কখনো তাহার উপর বাজারে-চলিত আদর্শের নকলে কৃত্রিম নকশা কাটা হয় – এইজন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব, কবি রাগই করুন আর খুশিই হউন, তাঁহার কাব্যের

একটা বিচার করিতেই হইবে – এবং যে-কেহ তাঁহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাঁহার বিচার করিবে – সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে, যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পাইয়া থাকেন তবে তাঁহার প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য, পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেইজন্যই বাহিরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। ঐখানেই বিপদ। কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

১৩২১

কবির কৈফিয়ত

আমরা যে-ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিমসমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম।

ইহাতে ক্ষতি ছিল না। একটা জিনিসকে আমি যদি বলি নৌকা-চালানো আর তুমি যদি বল দাঁড়-টানা, একটি কাব্যকে আমি যদি বলি রামায়ণ আর তুমি যদি বল রাম-রাবণের লড়াই, তাহা লইয়া আদালত করিবার দরকার ছিল না।

কিন্তু, মুশকিল হইয়াছে এই যে, কথাটা ব্যবহার করিতে আমাদের আজকাল লজ্জা বোধ হইতেছে। জীবনটা কেবলই লীলা! এ কথা শুনিলে জগতের সমস্ত পালোয়ানের দলেরা কী বলিবে যাহারা তিন ভুবনে কেবলই তাল ঠুকিয়া লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে!

আমি কবুল করিতেছি, আমার এখানে লজ্জা নাই। ইহাতে আমার ইংরেজি-মাস্টার তাঁর সবচেয়ে বড়ো শব্দভেদী বাণটা আমাকে মারিতে পারেন – বলিতে পারেন, “ওহে, তুমি নেহাৎ ওরিয়েন্টাল।’ কিন্তু, তাহাতে আমি মারা পড়িব না।

“লীলা’ বলিলে সবটাই বলা হইল, আর “লড়াই’ বলিলে লেজামুড়া বাদ পড়ে। এ লড়াইয়ের আগাই বা কোথায় আর গোড়াই বা কোথায়। ভাঙখোর বিধাতার ভাঙের প্রসাদ টানিয়া এ কি হঠাৎ আমাদের একটা মত্ততা। কেন রে বাপু, কিসের জন্য খামকা লড়াই।

বাঁচিবার জন্য।

আমার না-হক বাঁচিবার দরকার কী।

না বাঁচিলে যে মরিবে।

নাহয় মরিলাম।

মরিতে যে চাও না।

কেন চাই না।

চাও না বলিয়াই চাও না।

এই জবাবটা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, লীলা। জীবনের মধ্যে বাঁচিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটাই চরম কথা। সেইটে আছে বলিয়াই আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মানিয়া লই। সমস্ত জোর-জবরদস্তির সব শেষে একটা খুশি আছে – তার ওদিকে আর যাইবার জো নাই, দরকারও নাই। শতরঞ্চ খেলার আগাগোড়াই খেলা – মাঝখানে দাবাবড়ে চালাচালি এবং মহাভাবনা। সেই দুঃখ না থাকিলে খেলার কোনো অর্থই থাকে না। অপর পক্ষে খেলার আনন্দ না থাকিলে দুঃখের মতো এমন নিদারুণ নিরর্থকতা আর-কিছু নাই। এমন স্থলে শতরঞ্চকে আমি যদি বলি খেলা আর তুমি যদি বল দাবাবড়ের লড়াই, তবে তুমি আমার চেয়ে কম বৈ যে বেশি বলিলে এমন কথা আমি মানিব না।

কিন্তু, এ-সব কথা বলা কেন। জীবনটা কিম্বা জগৎটা যে লীলা, এ কথা শুনিতে পাইলেই যে মানুষ একদম কাজকর্মে ঢিল দিয়া বসিবে।

এই কথাটা শোনা না-শোনার উপরই যদি মানুষের কাজ করা না-করা নির্ভর করিত তবে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন গোড়ায় তাঁরই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সামান্য কবির উপরে রাগ করায় বাহাদুরি নাই।

কেন, সৃষ্টিকর্তা বলেন কী।

তিনি আর যাই বলুন, লড়াইয়ের কথাটা যত পারেন চাপা দেন। মানুষের বিজ্ঞান বলিতেছে, জগৎ জুড়িয়া অণুতে পরমাণুতে লড়াই। কিন্তু, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখি, সেই যুদ্ধ-ব্যাপার ফুল হইয়া ফোটে, তারা হইয়া জ্বলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি, ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালাবদল। বিজ্ঞান সেই সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখিতে পায়। সেই অবচ্ছিন্ন সত্য বিজ্ঞানের সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা কবির সত্যও নহে, কবিগুরুর সত্যও নয়।

অন্য কবির কথা রাখিয়া দাও, তুমি নিজের হইয়া বলো।

আচ্ছা, ভালো। তোমাদের নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ, এই-সব কথা আমার কাব্যে বার বার আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে, একটা কোনো সত্যে আমাকে পাইয়াছে। তার হাত আমার আর এড়াইবার জো নাই। অতএব, এখন হইতে আমি বিধাতার মতোই বেহায়া হইয়া এক কথা হাজার বার বলিব। যদি আমাকে বানাইয়া বলিতে হইত তবে ফি বারে নূতন কথা না বলিলে লজ্জা হইত। কিন্তু, সত্যের লজ্জা নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই। সে নিজেকেই প্রকাশ করে, নিজেকেই প্রকাশ করা ছাড়া তার আর গতি নাই, এইজন্যই সে বেপরোয়া।

এটা যেন তোমার অহংকারের মতো শোনাইতেছে।

সত্যের দোহাই দিয়া নিন্দা করিলে যদি দোষ না হয়, তবে সত্যের দোহাই দিয়া অহংকার করিলেও দোষ নাই। অতএব, এখানে তোমাতে আমাতে শোধবোধ হইল।

বাজে কথা আসিল। যে কথা লইয়া তর্ক হইতেছিল সেটা –

সেটা এই যে, জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা – অর্থাৎ গানকে বাদ দিয়া সুরের কসরতকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সবচেয়ে বড়ো কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান, জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই? আমরা তো ঐগুলোর উপরেই বেশি করিয়া জোর দিতে চাই; নহিলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়া।

উপনিষদ্ ইহার উত্তর দিয়াছেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেই বা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত – অর্থাৎ, কেইবা দুঃখধন্দা লেশমাত্র স্বীকার করিত – আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ, আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব, দুঃখ তো আছেই কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও, কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না। অতএব তোমরা যখন বল, হানাহানি করিতে করিতে যাহা টিকিল তাহাই সৃষ্টি, সেটা একটা অবিচ্ছিন্ন কথা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাব্স্ট্র্যাক্সন্ – আর আনন্দ হইতেই সমস্ত হইতেছে ও টিঁকিতেছে, এইটেই হইল পুরা সত্য।

আচ্ছা, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু এটা তো একটা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংসারের কাজে ইহার দাম কী।

সে জবাবদিহি কবির নয়, এমন-কি, বৈজ্ঞানিকেরও নয়। কিন্তু, যেরকম দিনকাল পড়িয়াছে কবিদের মতো সংসারের নেহাত অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়াইয়া চলিবার জো নাই। আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্রে রসকে চিরদিন অহেতুক অনির্বচনীয় বলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং যারা রসরে কারবারী তাহাদিগকে এ দেশে প্রয়োজনের হাটের মাসুল দিতে হয় নাই। কিন্তু, শুনিতে পাই, পশ্চিমের কোনো কোনো নামজাদা পাকা লোক রসকে কাব্যের চরম পদার্থ বলিয়া মানিতে রাজি নন, রসের তলায় কোনো তলানি পড়ে কি না সেইটে দেখিয়া নিক্তিতে মাপিয়া তাঁরা কাব্যের দাম ঠিক করিতে চান। সুতরাং, কোনো কথাতেই অনির্বচনীয়তার দোহাই দিতে গেলে আজকাল আমাদের দেশেও লোকে সেকেলে এবং ওরিয়েন্টাল বলিয়া নিন্দা করিতে পারে। সে নিন্দা অসহ্য নয়, তবু কাজের লোকদিগকে যতটুকু খুশি করিতে পারা যায় চেষ্টা করা ভালো। যদিচ আমি কবি মাত্র, তবু এ সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা একটু গোড়ার দিক হইতে বলিতে চাই।

জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাষ্ঠবস্তু গাছ নয়, তার রস টানিবার ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ – তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্যময়। গাছ আমাদিগকে যে আনন্দ দেয় সে এইজন্যই। এইজন্যই গাছ বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এইজন্যই গাছপালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়, ছুটির সত্য রূপটি দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দরূপ, সৌন্দর্যরূপ। তাহা কাজ বটে কিন্ত তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম একসঙ্গেই আছে।

সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া গেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে, জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে

না। বিশ্বের তালটা সে আজও সম্পূর্ণ কায়দা করিতে পারিল না। কথায় কথায় তাল কাটিয়া যায়। এইজন্য নিজের সৃষ্টিকে সে টুকরা টুকরা করিয়া ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে তাহাকে কোনোপ্রকারে তালে বাঁধিয়া লইতে চায়। কিন্তু, তাহাতে পুরা সংগীতের রস ভাঙিয়া যায় এবং সেই টুকরাগুলার মধ্যেও তালরক্ষা হয় না। ইহাতে মানুষের প্রায় সকল কাজেই যোঝাযুঝিটাই সব চেয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত, ছেলেদের শিক্ষা। মানবসন্তানের পক্ষে এমন নিদারুণ দুঃখ আর কিছুই নাই। পাখি উড়িতে শেখে, মা-বাপের গান শুনিয়া গান অভ্যাস করে, সেটা তার জীবলীলার অঙ্গ – বিদ্যার সঙ্গে প্রাণের ও মনের প্রাণান্তিক লড়াই নয়। সে-শিক্ষা আগাগোড়াই ছুটির দিনের শিক্ষা, তাহা খেলার বেশে কাজ। গুরুমশায় এবং পাঠশালা কী জিনিস ছিল একবার ভাবিয়া দেখো। মানুষের ঘরে শিশু হইয়া জন্মানো যেন এমন অপরাধ যে, বিশ বছর ধরিয়া তার শাস্তি পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক না করিয়া আমি কেবলমাত্র কবিত্বের জোরেই বলিব, এটা বিষম গলদ। কেননা, সৃষ্টিকর্তার মহলে বিশ্বকর্মার দলবল জগৎ জুড়িয়া গান গাহিতেছে –

মোদের, যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি, ভাই।

একদিন নীতিবিৎরা বলিয়াছিল, লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয়, এ কথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ আজ দেখিতেছি, শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দসুর ক্রমে লাগিতেছে – সেখানে বাঁশের জায়গা ক্রমেই বাঁশি দখল করিল।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া যখন দেশে ফিরিতেছিলাম দুইজন মিশনারি আমার পাছু ধরিয়াছিল। তাহাদের মুখ হইতে আমার দেশের নিন্দায় সমুদ্রের হাওয়া পর্যন্ত দূষিয়া উঠিল। কিন্তু, তাহারা নিজের স্বার্থ ভুলিয়া আমার দেশের লোকের যে কত অবিশ্রাম উপকার করিতেছে তাহার লম্বা ফর্দ আমার কাছে দাখিল

করিত। তাহাদের ফর্দটি জাল ফর্দ নয়, অঙ্কেও ভুল নাই। তাহারা সত্যই আমাদের উপকার করে, কিন্তু সেটার মতো নিষ্ঠুর অন্যায় আমাদের প্রতি আর কিছুই হইতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ায় গুর্খাফৌজ লাগাইয়া দেওয়াই ভালো। আমি এই কথা বলি, কর্তব্যনীতি যেখানে কর্তব্যের মধ্যেই বদ্ধ, অর্থাৎ যেখানে তাহা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌সন্‌, সেখানে সজীব প্রাণীর প্রতি তাহার প্রয়োগ অপরাধ। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌। কেননা, দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিলে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

কিন্তু, এমনি আমাদের অভ্যাস কদর্য হইয়াছে যে, আমরা নির্লজ্জের মতো বলিতে পারি যে, কর্তব্যের পক্ষে সরস না হইলেও চলে, এমন-কি, না হইলে ভালো চলে। লড়াই, লড়াই, লড়াই! আমাদিগকে বড়াই করিতে হইবে যে, আনন্দকে অবজ্ঞা করি আমরা এমনি বাহাদুর! চন্দন মাখিতে আমাদের লজ্জা, তাই রাই-সরিষার বেলেস্তারা মাখিয়া আমরা দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা ঐ বেলেস্তারাটাকে।

আসলে, মানুষের গলদটা এইখানে যে, পনেরো-আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক, সেখানেই তার আনন্দ; মা যেখানে মা সেখানে তার ঝঞ্ঝাট যত বেশিই হোক-না, সেখানেই তার আনন্দ। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি, যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে। তাই কার্লাইল প্রতিভাকে উলটা দিক দিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।

কিন্ত, মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে হয় নিজের মনিবকে নয় কোনো প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তুরের কর্মপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরো-আনা মানুষের কাজ অন্যের কাজ। জোর করিয়া মানুষ নিজেকে আর-কেহ কিম্বা আর-কিছুর মতো করিতে বাধ্য। চীনের

মেয়ের জুতা তার পায়ের মতো নহে, তার পা তার জুতার মতো। কাজেই পা কে দুঃখ পাইতে হয় এবং কুৎসিত হইতে হয়। কিন্তু, এমনতরো কুৎসিত হইবার মস্ত সুবিধা এই যে, সকলেরই সমান কুৎসিত হওয়া সহজ। বিধাতা সকলকে সমান করেন নাই; কিন্তু, নীতিতত্ত্ববিৎ যদি সকলকেই সমান করিতে চায় তবে তো লড়াই ছাড়া, কৃচ্ছ্রসাধন ছাড়া, কুৎসিত হওয়া ছাড়া আর কথা নাই।

সকল মানুষকেই রাজার, সমাজের, পরিবারের, মনিবের দাসত্ব করিতে হইতেছে। কেমন গোলমালে দায়ে পড়িয়া এইরকমটা ঘটিয়াছে। এইজন্যই লীলা কথাটাকে আমরা চাপা দিতে চাই। আমরা বুক ফুলাইয়া বলি, জিন-লাগাম পরিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তায় মুখ থুবড়াইয়া মরাই মানুষের পরম গৌরব। এ-সমস্ত দাসের জাতির দাসত্বের বড়াই। এমনি করিয়া দাসত্বের মন্ত্র আমাদের কানে আওড়ানো হয় পাছে এক মুহূর্তের জন্য আমাদের আত্মা আত্মগৌরবে সচেতন হইয়া উঠে। না, আমরা স্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়ার মতো লাগাম-বাঁধা মরিবার জন্য জন্মাই নাই। আমরা রাজার মতো বাঁচিব, রাজার মতো মরিব।

আমাদের সব চেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি। হে আবি, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ। সেই আনন্দরূপ গাছের চ্যালা কাঠ নহে, তাহা গাছ। তার মধ্যে হওয়া এবং করা একই।

আমার কথার জবাবে এ কথা বলা চলে যে, আনন্দরূপ মানুষের মধ্যে একবার ভাঙচুরের মধ্যে দিয়া তবে আবার আপনার অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। যতদিন তা না হয় ততদিন লড়াইয়ের মন্ত্র দিনরাত জপিতে হইবে; ততদিন লাগাম পরিয়া মুখ থুবড়িয়া মরিতে হইবে। ততদিন ইস্কুলে আপিসে আদালতে হাটে বাজারে কেবলই নরমেধযজ্ঞ চলিতে থাকিবে। সেই বলির পশুদের কানে বলিদানের ঢাক-ঢোলই খুব উচ্চৈঃস্বরে বাজাইয়া তাহাদের বুদ্ধিকে ঘুলাইয়া দেওয়া ভালো – বলা ভালো, এই হাড়কাঠই পরম দেবতা, এই খড়্‌গাঘাতই আশীর্বাদ, আর জল্লাদই আমাদের ত্রাণকর্তা।

তা হোক, বলিদানের ঢাক-ঢোল বাজুক আপিসে, বাজুক আদালতে, বাজুক বন্দীদের শিকলের ঝংকারের সঙ্গে তাল রাখিয়া। মরুক সকলে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া, শুষ্কতালু লইয়া, লাগাম কামড়াইয়া রাস্তার ধুলার উপরে। কিন্তু, কবির বীণায় বরাবর বাজিবে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না : Truth is beauty, beauty truth। ইহাতে আপিস আদালত কলেজ লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরেও এই সুর বাজিবে – সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোকবীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে : আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি – যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।

১৩২২

সাহিত্য

উপনিষদ্ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন – সত্যম, জ্ঞানম, এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় ক”রে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হল, আমরা আছি; আর-একটি, আমরা জানি; আর-একটি কথা তার সঙ্গে আছে তাই নিয়েই আজকের সভায় আমার আলোচনা। সেটি হচ্ছে, আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায় –I am, I know, I express, মানুষের এই তিন দিক নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য। সত্যের এই তিন ভাব আমাদের নানা কাজে ও প্রবর্তনায় নিয়ত উদ্যত করে। টিকতে হবে তাই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই। এই নিয়ে তার নানা রকমের সংগ্রহ রক্ষণ ও গঠনকার্য। “আমি আছি’ সত্যের এই ভাবটি তাকে নানা কাজ করায়। এইসঙ্গে আছে “আমি জানি’। এরও তাগিদ কম নয়। মানুষের জানার আয়োজন অতি বিপুল, আর তা কেবলই বেড়ে চলেছে, তার মূল্য মানুষের কাছে খুব বড়ো। এইসঙ্গে মানবসত্যের আর-একটি দিক আছে “আমি প্রকাশ করি’। “আমি আছি’ এটিই হচ্ছে ব্রহ্মের সত্যস্বরূপের অন্তর্গত; “আমি জানি’ এটি ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের অন্তর্গত; “আমি প্রকাশ করি’ এটি ব্রহ্মের অনন্তস্বরূপের অন্তর্গত।

“আমি আছি’ এই সত্যকে রক্ষা করাও যেমন মানুষের আত্মরক্ষা, তেমনি “আমি জানি’ এই সত্যকে রক্ষা করাও মানুষের আত্মরক্ষা – কেননা, মানুষের স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞানস্বরূপ। অতএব, মানুষ যে কেবলমাত্র জানবে কী দিয়ে, কী খাওয়ার দ্বারা আমাদের পুষ্টি হয়, তা নয়। তাকে নিজের জ্ঞানস্বরূপের গরজে রাত্রির পর রাত্রি জিজ্ঞাসা করতে হবে, মঙ্গলগ্রহে যে-চিহ্নজাল দেখা যায় সেটা কী। জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হয়তো তাতে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত পীড়িত হয়। অতএব, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তার জ্ঞানময় প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত ক’রে জানাই ঠিক জানা, তার প্রাণময় প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত যুক্ত ক’রে জানা ঠিক জানা নয়।

আমি আছি, আমাকে টিঁকে থাকতে হবে, এই কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় থাকে, তখন আত্মরক্ষা বংশরক্ষা কেবল আমাদের অহংকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু, যে পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্যের টিঁকে থাকার মধ্যেই আমার টিঁকে থাকা, সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়; সেই পরিমানে “আমি আছি’ এবং “অন্য সকলে আছে’ এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য; সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানাপ্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টিঁকে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ “আপনার থাকা অন্যের থাকার মধ্যে’ এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।

পূর্বে বলেছি, কেবলমাত্র নিজে নিজে একান্ত টিঁকে থাকবার ব্যাপারেও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু, সে জ্ঞানের দীপ্তি নেই। জ্ঞানের রাজ্যে যেখানে অসীমের প্রেরণা সেখানে মানুষের শিক্ষার কত উদ্যোগ, কত পাঠশালা, কত বিশ্ববিদ্যালয়, কত বীক্ষণ, কত পরীক্ষণ, কত আবিষ্কার, কত উদ্ভাবনা। সেখানে মানুষের জ্ঞান সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে মানবাত্মার সর্বত্র প্রবেশের অধিকারকে ঘোষণা করে। এই অধিকারের বিচিত্র আয়োজন বিজ্ঞানে দর্শনে বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্ত, তার বিশুদ্ধ আনন্দরসটি নানা রচনায় সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশ পায়।

তবেই একটা কথা দেখছি যে, পশউদের মতো মানুষেরও যেমন নিজে টিঁকে থাকবার ইচ্ছা প্রবল, পশুদের মতো মানুষেরও যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কৌতূহল সর্বদা সচেষ্ট, তেমনি মানুষের আর-একটি জিনিস আছে যা পশুদের নেই – সে ক্রমাগতই তাকে কেবলমাত্র প্রাণধারণের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।

প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই, সেখানে সে যা আনে তাই খায়। যাকে নিজেই সম্পূর্ণ শোষণ ক'রে নিয়ে নিঃশেষ না করতে পারি, তাই দিয়েই তো প্রকাশ। লোহা গরম হতে হতে যতক্ষণ না দীপ্ত তাপ পর্যন্ত যায় ততক্ষণ তার প্রকাশ নেই। আলো হচ্ছে তাপের ঐশ্বর্য। মানুষের যে-সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায়, যার প্রাচুর্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব। টাকার মধ্যে এই ঐশ্বর্য আছে কোন্‌খানে। যেখানে সে আমার একান্ত প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যেখানে সে আমার পকেটের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নয়, যেখানে তার সমস্ত রশ্মিই আমার কৃষ্ণবর্ণ অহংটার দ্বারা সম্পূর্ণ শোষিত না হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই তার মধ্যে অশেষের আবির্ভাব এবং এই অশেষই নানারূপে প্রকাশমান। সেই প্রকাশের প্রকৃতিই এই যে, আমরা সকলেই বলতে পারি — "এ যে আমার'। সে যখন অশেষকে স্বীকার করে তখনই সে কোনো একজন অমুক বিশেষ লোকের ভোগ্যতার মলিন সম্বন্ধ হতে মুক্ত হয়। অশেষের প্রসাদ-বঞ্চিত সেই বিশেষভোগ্য টাকার বর্বরতায় বসুন্ধরা পীড়িতা। দৈন্যের ভারের মতো আর ভার নেই। টাকা যখন দৈন্যের বাহন হয় তখন তার চাকার তলায় কত মানুষ ধুলিতে ধুলি হয়ে যায়। সেই দৈন্যেরই নাম প্রতাপ, তা আলোক নয়, তা কেবলমাত্র দাহ – সে যার কেবলমাত্র তারই, এইজন্যে তাকে অনুভব করা যায় কিন্তু স্বীকার করা যায় না। নিখিলের সেই স্বীকার-করাকেই বলে প্রকাশ।

এই প্রতাপের রক্তপঙ্কিল অশুচি স্পর্শকে প্রকৃতি তার শ্যামল অমৃতের ধারা দিয়ে মুছে মুছে দিচ্ছে। ফুলগুলি সৃষ্টির অন্তঃপুর থেকে সৌন্দর্যের ডালি বহন করে নিয়ে এসে প্রতাপের কলুষিত পদচিহ্নগুলোকে লজ্জায় কেবলই ঢাকা দিয়ে দিয়ে চলেছে। জানিয়ে দিচ্ছে যে, "আমরা ছোটো, আমরা কোমল, কিন্তু আমরাই চিরকালের। কেননা, সকলেই আমাদের বরণ ক'রে নিয়েছে – আর, ঐ-যে উদ্যতমুষ্টি বিভীষিকা, যে পাথরের 'পরে পাথর চাপিয়ে আপনার কেল্লাকে অভ্রভেদী ক'রে তুলছে সে কিছুই নয়, কেননা ওর নিজে ছাড়া আর কেউই ওকে স্বীকার করছে না – মাধবীবিতানের সুন্দরী ছায়াটিও ওর চেয়ে সত্য।'

এই-যে তাজমহল – এমন তাজমহল, তার কারণ সাজাহানের হৃদয়ে তাঁর প্রেম, তাঁর বিরহবেদনার আনন্দ অনন্তকে স্পর্শ করেছিল; তাঁর সিংহাসনকে তিনি যে-কোঠাতেই রাখুন তিনি তাঁর তাজমহলকে তাঁর আপন থেকে মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। তার আর আপন-পর নেই, সে অনন্তের বেদি। সাজাহানের প্রতাপ যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন তার লুঠের মাল যতই প্রভূত হোক তাতে ক'রে তার নিজের থলিটারও পেট ভরে না, সুতরাং ক্ষুধার অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। আর, যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে নিজের বিপুল রাজ্যে সাম্রাজ্যে কোথাও সে আর ধ'রে রেখে দিতে পারে না। সর্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া আর গতি নেই। একেই বলে প্রকাশ। আমাদের সমস্ত মঙ্গল-অনুষ্ঠানে গ্রহণ করবার মন্ত্র হচ্ছে ওঁ – অর্থাৎ, হাঁ। তাজমহল হচ্ছে সেই নিত্য-উচ্চারিত ওঁ – নিখিলের সেই গ্রহণ-মন্ত্র মূর্তিমান। সাজাহানের সিংহাসনে সেই মন্ত্র পড়া হয় নি; একদিন তার যতই শক্তি থাক্-না কেন, সে তো "না' হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল। তেমনি কত কত বড়ো বড়ো নামধারী "না' এর দল আজ দম্ভভরে বিলুপ্তির দিকে চলেছে, তাদের কামান-গর্জিত ও বন্দীদের শৃঙ্খল-ঝংকৃত কলরবে কান বধির হয়ে গেল, কিন্তু তারা মায়া, তারা নিজেরই মৃত্যুর নৈবেদ্য নিয়ে কালরাত্রীপারাবারের কালীঘাটে সব যাত্রা ক'রে চলেছে। কিন্তু, ঐ সাজাহানের কন্যা জাহানারার একটি কান্নার গান? তাকে নিয়ে আমরা বলেছি, ওঁ।

কিন্তু, আমরা দান করতে চাইলেই কি দান করতে পারি। যদি বলি "তুভ্যমহং সম্প্রদদে', তা হলেই কি বর এসে হাত পাতেন। নিত্যকাল এবং নিখিল বিশ্ব এই কথাই বলেন – "যদেতৎ হৃদয়ং মম' তার সঙ্গে তোমার সম্প্রদানের মিল থাকা চাই। তোমার অনন্তম্ যা দেবেন আমি তাই নিতে পারি। তিনি মেঘদূতকে নিয়েছেন – তা উজ্জয়িনীর বিশেষ সম্পত্তি না, তাকে বিক্রমাদিত্যের সিপাই সান্ত্রী পাহারা দিয়ে তার অন্তঃপুরের হংসপদিকাদের মহলে আটকে রাখতে পারে নি। পণ্ডিতরা লড়াই করতে থাকুন, তা খৃষ্টজন্মের পাঁচশো বছর পূর্বে কি পরে রচিত। তার গায়ে সকল তারিখেরই ছাপ আছে।

পণ্ডিতেরা তর্ক করতে থাকুন, তা শিপ্রাতীরে রচিত হয়েছিল না গঙ্গাতীরে। তার মন্দাক্রান্তার মধ্যে পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সকল নদীরই কলধ্বনি মুখরিত। অপর-পক্ষে এমন সব পাঁচালি আছে যার অনুপ্রাসছটার চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গবর্ষণে সভাস্থ হাজার হাজার লোকে মুগ্ধ হয়ে গেছে; তাদের বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতায় আমরা যতই উত্তেজিত হই-না কেন, সে-সব পাঁচালির দেশ ও কাল সুনির্দিষ্ট; কিন্তু সর্বদেশ ও সর্বকাল তাদের বর্জন করাতে তারা কুলীনের অনূঢ়া মেয়ের মতো ব্যর্থ কুলগৌরবকে কলাগাছের কাছে সমর্পণ ক'রে নিঃসন্ততি হয়ে চলে যাবে।

উপনিষদ যেখানে ব্রহ্মের স্বরূপের কথা বলেছেন অনন্তম্, সেখানে তাঁর প্রকাশের কথা কী বলেছেন। বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। এইটে হল আমাদের আসল কথা। সংসারটা যদি গারদখানা হত তা হলে সকল সিপাই মিলে রাজদণ্ডের ঠেলা মেরেও আমাদের টলাতে পারত না। আমরা হরতাল নিয়ে বসে থাকতেম, বলতেম "আমাদের পানাহার বন্ধ'। কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই দেখছি, কেবল যে চারিদিকে তাগিদ আছে তা নয়।

বারে বারে আমার যে হৃদয় যে মুগ্ধ হয়েছে। এর কী দরকার ছিল। টিটাগড়ের পাটকলের কারখানায় যে মজুরেরা খেটে মরে তারা মজুরি পায়, কিন্তু তাদের হৃদয়ের জন্যে তো কারো মাথাব্যথা নেই। তাতে তো কল বেশ ভালোই চলে। যে-মালিকেরা শতকরা ৪০০টাকা হারে মুনাফা নিয়ে থাকে তারা তো মনোহরণের জন্য এক পয়সাও অপব্যয় করে না। কিন্তু, জগতে তো দেখছি, সেই মনোহরণের আয়োজনের অন্ত নেই। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, এ কেবল বোপদেবের মুগ্ধবোধের সূত্রজাল নয়, এ যে দেখি কাব্য। অর্থাৎ, দেখছি ব্যাকরণটা রয়েছে দাসীর মতো পিছনে, আর রসের লক্ষ্মী রয়েছেন সামনেই। তা হলে কি এর প্রকাশের মধ্যে দণ্ডীর দণ্ডই রয়েছে না রয়েছে কবির আনন্দ?

এই-যে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, এই-যে আকাশ থেকে ধরণী পর্যন্ত সৌন্দর্যের প্লাবন, এর মধ্যে তো কোনো জবরদস্ত্ পাহারাওয়ালার তকমার চিহ্ন দেখতে পাই নে। ক্ষুধার মধ্যে

একটা তাগিদ আছে বটে, কিন্তু ওটা তো স্পষ্টই একটা “না’ এর ছাপ-মারা জিনিস। “হাঁ’ আছে বটে ক্ষুধা-মেটাবার সেই ফলটির মধ্যে, রসনা যাকে সরস আগ্রহের সঙ্গে আত্মীয় বলে অভ্যর্থনা করে নেয়। তাহলে কোন্‌টাকে সামনে দেখবো আর কোন্‌টাকে পিছনে? ব্যাকরণটাকে না কাব্যটিকে? পাকশালকে না ভোজের নিমন্ত্রণকে? গৃহকর্তার উদ্দেশ্যটি কোন্‌খানে প্রকাশ পায় – যেখানে, নিমন্ত্রণপত্র হাতে, ছাতা মাথায় হেঁটে এলেম না যেখানে আমার আসন পাতা হয়েছে? সৃষ্টি আর সর্জন হল একই কথা। তিনি আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন করেছেন, বিলিয়ে দিয়েছেন ব’লেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন – তাই আমাদের হৃদয় বলে “আঃ বাঁচলেম’ ।

শুক্ল সন্ধ্যার আকাশ জ্যোৎস্নায় উপছে পড়েছে – যখন কমিটি-মিটিঙে তর্ক বিতর্ক চলেছে তখন সেই আশ্চর্য খবরটি ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু তার পর যখন দশটা রাত্রে ময়দানের সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি তখন ঘন চিন্তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে যে প্রকাশটি আমার মনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় তাকে দেখে আর কী বলব। বলি, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সেই যে যৎ আনন্দরূপে যার প্রকাশ, সে কোন্ পদার্থ। সে কি শক্তি-পদার্থ।

রান্নাঘরে শক্তির প্রকাশ লুকিয়ে আছে। কিন্তু, ভোজের থালায় সে কি শক্তির প্রকাশ। মোগলসম্রাট প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন শক্তিকে। সেই বিপুল কাঠখড়ের প্রকাশকে কি প্রকাশ বলে। তার মূর্তি কোথায়। আওরঙজেবের নানা আধুনিক অবতাররাও রক্তরেখায় শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে অতি বিপুল আয়োজন করেছেন। কিন্তু যিনি আবিঃ, যিনি প্রকাশস্বরূপ, আনন্দরূপে যিনি ব্যক্ত হচ্ছেন, তিনি সেই রক্তরেখার উপরে রবার বুলোতে এখনি শুরু করেছেন। আর, তাঁর আলোকরশ্মির সম্মার্জনী তাদের আয়োজনের আবর্জনার উপর নিশ্চয় পড়তে আরম্ভ হয়েছে। কেননা, তাঁর আনন্দ যে প্রকাশ, আর আনন্দই যে তাঁর প্রকাশ।

এই প্রকাশটিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর শক্তিকে যদি তিনি সামনে রাখতেন তাহলে তাঁকে মানার মতো অপমান আমার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। যখন জাপানে যাচ্ছিলাম

জাহাজ পড়ল দারুণ ঝড়ে। আমি ছিলেম ডেকে বসে। আমাকে ডুবিয়ে মারার পক্ষে পবনের একটা ছোটো নিশ্বাসই যথেষ্ট; কিন্তু কালো সাগরের বুকের উপর পাগলা ঝড়ের যে-নৃত্য তার আয়োজন হচ্ছে আমার ভিতরে যে পাগল মন আছে তাকে মাতিয়ে তোলবার জন্যে। ঐ বিপুল সমারোহের দ্বারাই পাগলের সঙ্গে পাগলের মোকাবিলায় রহস্যালাপ হতে পারল। নাহয় ডুবেই মরতেম – সেটা কি এর চেয়ে বড়ো কথা। রুদ্রবীণার ওস্তাদজি তাঁর এই রুদ্রবীণার শাগরেদকে ফেনিল তরঙ্গ-তাণ্ডবের মধ্যে দুটো-একটা চক্র-হাওয়ার দ্রুত-তালের তান শুনিয়ে দিলেন। সেইখানে বলতে পারলেম, “তুমি আমার আপনার’ ।

অমৃতের দুটি অর্থ – একটি যার মৃত্যু নেই, এবং যা পরম রস। আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হল রস। অমৃতও যদি সেই রসই হয় তবে রসের কথা পুনরুক্ত হয় মাত্র। কাজেই এখানে বলব অমৃত মানে যা মৃত্যুহীন – অর্থাৎ আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানেই সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। সবাই দেখাচ্ছে কালের ভয়। কালের রাজত্বে থেকেও কালের সঙ্গে যার অসহযোগ সে কোথায়।

এইবারে আমাদের কথা। কাব্য যেটি ছন্দে গাঁথা হয়, রূপদক্ষ যে-রূপ রচনা করেন, সেটি যদি আনন্দের প্রকাশ হয় তবে সে মৃত্যুজয়ী। – এই “রূপদক্ষ’ কথাটি আমার নূতন পাওয়া। ইন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন্‌ অর্থাৎ একটা প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গেছে, আর্টিস্টের একটা চমৎকার প্রতিশব্দ। –

কাব্যের বা চিত্রের তো সমাপ্তিতে সমাপ্তি নেই। মেঘদূত শোনা হয়ে গেল, ছবি দেখে বাড়ি ফিরে এলেম, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অবসাদকে তো নিয়ে এলেম না। গান যখন সমে এসে থামল তখন ভারি আনন্দে মাথা ঝাঁকা দিলেম। সম মানে তো থামা, তাতে আনন্দ কেন – তার কারণ হচ্ছে, আনন্দরূপ থামাতে থামে না। কিন্তু, টাকাটা যেই ফুরিয়ে গেল তখন তো সমে মাথা নেড়ে বলি নে – “আঃ’ ।

গান থামল – তবু সে শূন্যের মতো অন্ধকারের মতো থামল না কেন। তার কারণ, গানের মধ্যে একটি তত্ত্ব আছে যা সমগ্র বিশ্বের আত্মার মধ্যে আছে – কাজেই সে সেই "ওঁ'কে আশ্রয় করে থেকে যায়; তার জন্যে কোনো গর্ত কোথাও নেই। এই গান আমি শুনি বা নাই শুনি, তাকে প্রত্যক্ষত কেউ নিল বা নাই নিল, তাতে কিছুই আসে-যায় না। কত অমূল্যধন চিত্রে কাব্যে হারিয়ে গেছে কিন্তু সেটা একটা বাহ্য ঘটনা, একটা আকস্মিক ব্যাপার। আসল কথা হচ্ছে এই যে, তারা আনন্দের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেছে, প্রয়োজনের দৈন্যকে করে নি। সেই দৈন্যের রূপটা যদি দেখতে চাও তবে পাটকলের কারখানায় গিয়ে ঢোকো যেখানে গরীব চাষার রক্তকে ঘূর্ণীচাকার পাক দিয়ে বহুশতকরা হারের মুনাফায় পরিণত করা হচ্ছে। গঙ্গাতীরের বটচ্ছায়াসমাস্রিত যে-দেউলটিকে লোপ ক'রে দিয়ে ঐ প্রকাণ্ড-হাঁ-করা কারখানা কালো ধোঁয়া উদ্‌গীর্ণ করছে সেই লুপ্ত দেউলের চেয়েও ঐ কারখানা-ঘর মিথ্যা। কেননা, আনন্দলোকে ওর স্থান নেই।

বসন্তে ফুলের মুকুল রাশি রাশি ঝরে যায়, ভয় নেই, কেননা ক্ষয় নেই। বসন্তের ডালিতে অমৃতমন্ত্র আছে। রূপের নৈবেদ্য ভরে ভরে ওঠে। সৃষ্টির প্রথম যুগে যে-সব ভূমিকম্পের মহিষ তার শিঙের আক্ষেপে ভূতল থেকে তপ্তপঙ্ক উৎক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিল তারা আর ফিরে এল না; যে-সব অগ্নিনাগিনী রসাতলের আবরণ ফুঁড়ে ক্ষণে ক্ষণে ফণা তুলে পৃথিবীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছিল তারা কোন্ বাঁশি শুনে শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু কচি কচি শ্যামল ঘাসের কোমল চুম্বন আকাশের নীল চোখকে বারে বারে জুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা দিনে দিনে ফিরে ফিরে আসে। আমার ঘরের দরজার কাছে কয়েকটি কাঁটা গাছে বসন্তের সোহাগে ফুল ফুটে ওঠে। সে হল কন্টিকারীর ফুল। তার বেগুনি রঙের কোমল বুকের মাঝখানে একটুখানি হলদে সোনা। আকাশে তাকিয়ে যে-সূর্যের কিরণকে সে ধ্যান করে সেই ধ্যানটুকু তার বুকের মাঝখানটিতে যেন মধুর হয়ে রইল। এই ফুলের কি খ্যাতি আছে। আর, এ কি ঝরে ঝরে পড়ে না। কিন্তু, তাতে ক্ষতি হল কী। পৃথিবীর অত বড়ো বড়ো পালোয়ানের চেয়ে সে নির্ভয়। অন্তরের আনন্দের মধ্যে সে রয়েছে, সে অমৃত। যখন বাইরে সে নেই তখনও রয়েছে।

মৃত্যুর হাতুড়ি পিটিয়েই মহাকালের দরবারে অমৃতের যাচাই হতে থাকে। খৃষ্টের মৃত্যুসংবাদে এই কথাটাই না খৃষ্টীয় পুরাণে আছে। মৃত্যুর আঘাতেই তাঁর অমৃতের শিখা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ হল না কি। কিন্তু, একটি কথা মনে রাখতে হবে – আমার কাছে বা তোমার কাছে ঘাড়-নাড়া পাওয়াকেই অমৃতের প্রকাশ বলে না। যেখানে সে রয়ে গেল সেখানে আমাদের দৃষ্টি না যেতেও পারে, আমাদের স্মৃতির পরিমাণে তার অমৃতত্বের পরিমাণ নয়। পূর্ণতার আবির্ভাবকে বুকে করে নিয়ে সে যদি এসে থাকে তা হলে মূহুর্তকালের মধ্যেই সে নিত্যকে দেখিয়ে দিয়েছে – আমার ধারণার উপরে তার আশ্রয় নয়।

হয়তো এ-সব কথা তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় পড়ে – আমার মতো আনাড়ির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া অসংগত। কিন্তু, আমি সেই শিক্ষকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি নে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় অন্তরে বাহিরে রসের যে-পরিচয় পেয়েছি আমি তারই কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছি। তাই আমি এখানে আহরণ করছি। আমাদের দেশে পরমপুরুষের একটি সংজ্ঞা আছে; তাঁকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ। এর মধ্যে আনন্দটিই হচ্ছে সবশেষের কথা, এর পরে আর-কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কি না।

১৩৩০

তথ্য ও সত্য

সাহিত্য বা কলা-রচনায় মানুষের যে চেষ্টার প্রকাশ, তার সঙ্গে মানুষের খেলা করবার প্রবৃত্তিকে কেউ কেউ এক করে দেখেন। তাঁরা বলেন, খেলার মধ্যে প্রয়োজন-সাধনের কোনো কথা নেই, তার উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ অবসরবিনোদন; সাহিত্য ও ললিতকলারও সেই উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

আমি কাল বলেছি যে, আমাদের সত্তার একটা দিক হচ্ছে প্রাণধারণ, টিঁকে থাকা। সেজন্যে আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক বেগ-আবেগ আছে। সেই তাগিদেই শিশুরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ে, আরো একটু বড়ো হলে অকারণে ছুটোছুটি করতে থাকে। জীবনযাত্রায় দেহকে ব্যবহার করবার প্রয়োজনে প্রকৃতি এইরকম অনর্থকতার ভান করে আমাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ছোটো মেয়ে যে-মাতৃভাব নিয়ে জন্মেছে তার পরিচালনার জন্যেই সে পুতুল নিয়ে খেলে। প্রাণধারণের ক্ষেত্রে জিগীষাবৃত্তি একটি প্রধান অস্ত্র; বালকেরা তাই প্রকৃতির প্রেরণায় প্রতিযোগিতার খেলায় সেই বৃত্তিতে শান দিতে থাকে।

এইরকম খেলাতে আমাদের বিশেষ আনন্দ আছে; তার কারণ এই যে, প্রয়োজন-সাধনের জন্য আমরা যে-সকল প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছি, প্রয়োজনের উপস্থিত দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে তাদের খেলায় প্রকাশ করতে পাই। এই হচ্ছে ফলাশক্তিহীন কর্ম; এখানে কর্মই চরম লক্ষ্য, খেলাতেই খেলার শেষ। তৎসত্ত্বেও খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজনসাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেইজন্যে খেলার মধ্যে জীবনযাত্রার নকল এসে পড়ে। কুকুরের জীবনযাত্রায় যে-লড়াইয়ের প্রয়োজন আছে দুই কুকুরের খেলার মধ্যে তারই নকল দেখতে পাই। বিড়ালের খেলা ইঁদুর-শিকারের নকল। খেলার ক্ষেত্র জীবনযাত্রা ক্ষেত্রের প্রতিরূপ।

অপর পক্ষে, যে-প্রকাশচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি। বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের যে-মূলধন আছে তারই একটা উদ্‌বৃত্ত অংশকে নিয়ে সাহিত্যে আমরা জীবন-ব্যাবসায়েরই নকল করে থাকি, এ কথা বলতে তো মন সায় দেয় না। কবিতার বিষয়টি যাই হোক-না কেন, এমন-কি, সে যদি দৈনিক একটা তুচ্ছ ব্যাপারই হয়, তবু সেই বিষয়টিকে শব্দচিত্রে নকল করে ব্যক্ত করা তার উদ্দেশ্য কখনোই নয়।

বিদ্যাপতি লিখছেন –

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

গোধূলিবেলায় পূজা শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে – আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনাই প্রত্যহ ঘটে। এ কবিতা কি শব্দরচনার দ্বারা তারই পুনরাবৃত্তি। জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্বমুক্ত ভাবে সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য। তা কখনোই স্বীকার করতে পারি নে। বস্তুত, মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষমাত্র করে ছন্দে-বন্ধে বাক্য-বিন্যাসে উপমাসংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।

ইংরেজ কবি কীট্‌স একটি গ্রীক পূজাপাত্রকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছেন। যে-শিল্পী সেই পাত্রকে রচনা করেছিল সে তো কেবলমাত্র একটি আধারকে রচনা করে নি। মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ মাত্র ঘটাবার জন্যে এই পাত্রের সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনকে রূপ দেওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল না। প্রয়োজনসাধন এর দ্বারা নিশ্চয়ই

হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের মধ্যেই এ নিঃশেষ হয়নি। তার থেকে এ অনেক স্বতন্ত্র, অনেক বড়ো। গ্রীক শিল্পী সুষমাকে, পূর্ণতার একটি আদর্শকে, প্রত্যক্ষতা দান করেছে; রূপলোকে অপরূপকে ব্যক্ত করেছে। সে কোনো সংবাদ দেয় নি, বহিঃসংসারের কোনো-কিছুর পুনরাবৃত্তি করে নি। অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে-চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপ সৃষ্টি করবার বৃত্তি; প্রয়োজন-সাধনের বৃত্তি নয়। তাতে মানুষের নিত্যকর্মের , দৈনিক জীবনের সম্বন্ধ থাকতেও পারে। কিন্তু, সেটা অবান্তর।

আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা-কিছু জানি কোনো-না কোনো ঐক্যসূত্রে জানি। কোনো জানা আপনাতেই একান্ত স্বতন্ত্র নয়। যেখানে দেখি আমাদের পাওয়া বা জানার অস্পষ্টতা সেখানে জানি, মিলিয়ে জানতে না পারাই তার কারণ। আমাদের আত্মার মধ্যে জ্ঞানে ভাবে এই-যে একের বিহার, সেই এক যখন লীলাময় হয়, যখন সে সৃষ্টির দ্বারা আনন্দ পেতে চায়, সে তখন এককে বাহিরে সুপরিস্ফূট করে তুলতে চায়। তখন বিষয়কে উপলক্ষ ক'রে, উপাদানকে আশ্রয় ক'রে একটি অখণ্ড এক ব্যক্ত হয়ে ওঠে। কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় গ্রীক শিল্পীর পূজাপাত্রে বিচিত্র রেখার আবর্তনে যখন আমরা পরিপূর্ণ এককে চরম রূপে দেখি, তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়। যে-মানুষ অরসিক সে এই চরম এককে দেখতে পায় না; সে কেবল উপাদানের দিক থেকে, প্রয়োজনের দিক থেকে এর মূল্য নির্ধারণ করে। –

শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে বহল কুসুমগন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতী যূথী
মত্তমধুপভোরনী।

বিষয়ে ভাবে বাক্যে ছন্দে নিবিড় সম্মিলনের দ্বারা যদি এই কাব্যে একের রূপ পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, যদি সেই একের আবির্ভাবই চরম হয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকার করে,

যদি এই কাব্য খণ্ড খণ্ড হয়ে উল্কাবৃষ্টির দ্বারা আমাদের মনকে আঘাত না করতে থাকে, যদি ঐক্যরসের চরমতাকে অতিক্রম করে আর-কোনো উদ্দেশ্য উগ্র হয়ে না ওঠে, তা হলেই এই কাব্যে আমরা সৃষ্টিলীলাকে স্বীকার করব।

গোলাপ-ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি। এর মধ্যে আমাদের আত্মারূপী এক আপন আত্মীয়তা স্বীকার করে, তখন এর আর-কোনো মূল্যের দরকার হয় না। অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দরূপ।

গোলাপের মধ্যে সুনিহিত সুবিহিত সুষমাযুক্ত যে-ঐক্য নিখিলের অন্তরের মধ্যেও সেই ঐক্য। সমস্তের সংগীতের সঙ্গে এই গোলাপের সুরটুকুর মিল আছে; নিখিল এই ফুলের সুষমাটিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে।

এই কথাটাকে আর-এক দিক থেকে বোঝাবার চেষ্টা করি। আমি যখন টাকা করতে চাই তখন আমার টাকা করবার নানাপ্রকার চেষ্টা ও চিন্তার মধ্যে একটি ঐক্য বিরাজ করে। বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে একটিমাত্র লক্ষ্যের ঐক্য অর্থকামীকে আনন্দ দেয়। কিন্তু, এই ঐক্য আপন উদ্দেশ্যের মধ্যেই খণ্ডিত, নিখিলের সৃষ্টিলীলার সঙ্গে যুক্ত নয়। ধনলোভী বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে খাবলে নিয়ে আপন মুনাফার মধ্যে সঞ্চিত করতে থাকে। অর্থকামনার ঐক্য বড়ো ঐক্যকে আঘাত করতে থাকে। সেইজন্যে উপনিষদ যেখানে বলেছেন, নিখিল বিশ্বকে একের দ্বারা পূর্ণ করে দেখবে, সেইখানেই বলেছেন, মা গৃধঃ – লোভ করবে না। কারণ, লোভের দ্বারা একের ধারণা থেকে, একের আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হতে হয়। লোভীর হাতে কামনার সেই লণ্ঠন যা কেবল একটি বিশেষ সংকীর্ণ জায়গায় তার সমস্ত আলো সংহত করে; বাকি সব জায়গার সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য গভীর অন্ধকারে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। অতএব, লোভের এই সংকীর্ণ ঐক্যের সঙ্গে সৃষ্টির ঐক্যের, রস-সাহিত্য ও ললিতকলার ঐক্যের সম্পূর্ণ তফাত। নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস। লক্ষপতি টাকার থলি নিয়ে ভেদ ঘোষণা করে; আর গোলাপ

নিখিলের দূত, একের বার্তাটি নিয়ে সে ফুটে ওঠে। যে এক অসীম, গোলাপের হৃদয়টুকু পূর্ণ করে সেই তো বিরাজ করে। কীট্‌স্‌ তাঁর কবিতায় নিখিল একের সঙ্গে গ্রীকপাত্রটির ঐক্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন –

> Thou silent from, dost tease us out of thought,
> as doth eternity.

হে নীরব মূর্তি, তুমি আমাদের মনকে ব্যাকুল করে সকল চিন্তার বাইরে নিয়ে যাও, যেমন নিয়ে যায় অসীম।

কেননা, অখণ্ড একের মূর্তি যে-আকারেই থাক্‌-না অসীমকেই প্রকাশ করে; এইজন্যই সে অনির্বচনীয়, মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।

অসীম একের সেই আকৃতি যা ঋতুদের ডালায় ডালায় ফুলে ফুলে বারে বারে পূর্ণ হয়ে নিঃশেষিত হল না, সেই সৃষ্টির আকৃতিই তো রূপদক্ষের কারুকলার মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদাস ক'রে নিয়ে যায়। অসীম একের আকৃতিই তো সেই বেদনা যা বেদ বলেছেন, সমস্ত আকাশকে ব্যথিত করে রয়েছে। সে "রোদসী', "ক্রন্দসী' – সে কাঁদছে। সৃষ্টির কান্না রূপে রূপে, আলোয় আলোয়, আকাশে আকাশে নানা আবর্তনে আবর্তিত – সূর্যে চন্দ্রে, গ্রহে নক্ষত্রে, অণুতে পরমাণুতে, সুখে দুঃখে, জন্মে মরণে। সমস্ত আকাশের সেই কান্না মানুষের অন্তরে এসে বেজেছে। সমস্ত আকাশের সেই কান্নাই একটি সুন্দর জলপাত্রের রেখায় রেখায় নিঃশব্দ হয়ে দেখা দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের অমৃতনির্ঝরের রসধারা ভরতে হবে ব'লেই শিল্পীর মনে ডাক পড়েছিল; অব্যক্তের গভীরতা থেকে অনির্বচনীয়ের রসধারা। এতে ক'রে যে-রস মানুষের কাছে এসে পৌঁছবে সে তো শরীরের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে নয়। শরীরের পিপাসা মেটাবার যে-জল তার জন্যে, ভাঁড় হোক, গণ্ডূষ হোক, কিছুতেই আসে যায় না। এমন অপরূপ পাত্রের প্রয়োজন কী; কী বিচিত্র এর গড়ন, কত রঙ দিয়ে আঁকা। এ'কে সময় নষ্ট করা বললে প্রতিবাদ করা যায় না। রূপদক্ষ আপনার চিত্তকে এই একটি ঘটের উপর উজাড় ক'রে

ঢেলে দিয়েছে; বলতে পার, সমস্তই বাজে খরচ হল। সে কথা মানি; সৃষ্টির বাজে-খরচের বিভাগেই অসীমের খাস-তহবিল। ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা, রূপের ভঙ্গি। যারা মুনাফার হিসাব রাখে তারা বলে, এটা লোকসান; যারা সন্ন্যাসী তারা বলে, এটা অসংযম। বিশ্বকর্মা তাঁর হাপর হাতুড়ি নিয়ে ব্যস্ত, এর দিকে তাকান না। বিশ্বকবি এই বাজে-খরচের বিভাগে তাঁর থলি ঝুলি কেবলই উজাড় ক'রে দিচ্ছেন, অথচ রসের ব্যাপার আজও দেউালে হল না।

শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কী। সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা। সে বলছে, "আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে রঙে সুরে বাণীতে নৃত্যে। যে যেমন করে পার আমার অব্যক্ত ব্যথাটিকে ব্যক্ত করে দাও।' এই ব্যাকুল প্রার্থনা যার হৃদয়ের গভীরে এসে পৌঁচেছে সে আপিসের তাড়া, ব্যবসায়ের তাগিদ, হিতৈষীর কড়া হুকুম ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিছু না, একখানি তম্বুরা হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে। কী যে করবে কে জানে। সুরের পর সুর, রাগের পর রাগ যে তার অন্তরে বাজিয়ে তুলবে সে কে। সে তো বিজ্ঞানে যাকে প্রকৃতি ব'লে থাকে সেই প্রকৃতি নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের জমা-খরচের খাতায় তার হিসাব মেলে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন তার জঠরের মধ্যে হুকুম জাহির করছে। কিন্তু, মানুষ কি পশু যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাবুকের চোটে প্রকৃতির নির্দিষ্ট পথে চলবে। লীলাময় মানুষ প্রকৃতিকে ডেকে বললে, "আমি রসে ভোর, আমি তোমাদের তাঁবেদার নই, চাবুক লাগাও তোমার পশুদের পিঠে। আমি তো ধনী হতে চাই নে, আমি তো পালোয়ান হতে চাই নে, আমার মধ্যে সেই বেদনা আছে যা নিখিলের অন্তরে। আমি লীলাময়ের শরিক।'

এই কথাটি জানতে হবে – মানুষ কেন ছবি আঁকতে বসে, কেন গান করে। কখনো কখনো যখন আপন-মনে গান গেয়েছি তখন কীট্‌সের মতোই আমাকেও একটা গভীর প্রশ্ন ব্যাকুল করে তুলেছে, জিজ্ঞাসা করেছি – এ কি একটা মায়ামাত্র না এর কোনো অর্থ আছে। গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে

বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল। কেন। কেননা, গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না ব'লেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সত্যের ছোটো বড়ো সকল রূপই যে অনির্বচনীয় তা আমরা অনুভব করতে পারি নে। নিত্য-অভ্যাসের স্থূল পর্দায় তার দীপ্তিকে আবৃত করে দেয়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায়; সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখে নি।

একটু বেশি কবিত্ব লাগছে? শ্রোতারা মনে ভাবছেন, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের মন যে জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করে সেটা দুইমুখো পদার্থ; তার একটা দিক হচ্ছে তথ্য, আর-একটা দিক হচ্ছে সত্য। যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য; সেই তথ্য যাকে অবলম্বন ক'রে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।

আবার ব্যক্তিরূপটি হচ্ছে আমাতে বদ্ধ আমি। এই-যে তথ্যটি এ অন্ধকারবাসী, এ আপনাকে আপনি প্রকাশ করতে পারে না। যখনই এর পরিচয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে তখনই একটি বড়ো সত্যের দ্বারা এর পরিচয় দিতে হবে, যে সত্যকে সে আশ্রয় করে আছে। বলতে হবে, আমি বাঙালী। কিন্তু বাঙালী কী। ও তো একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থ, ধরা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। তা হোক, ঐ ব্যাপক সত্যের দ্বারাই তথ্যের পরিচয়। তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র – সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। আমি ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।

যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় ক'রে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ। আমি ব্যক্তিগত আমি, এটা হল আমার সীমার দিকের কথা;

এখানে আমি ব্যাপক একের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি মানুষ, এটা হল আমার অসীমের অভিমুখী কথা; এখানে আমি বিরাট একের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশমান।

চিত্রী যখন ছবি আঁকতে বসেন তখন তিনি তথ্যের খবর দেবার কাজে বসেন না। তখন তিনি তথ্যকে ততটুকু মাত্র স্বীকার করেন যতটুকুর দ্বারা তাকে উপলক্ষ ক'রে কোনো একটা সুষমার ছন্দ বিশুদ্ধ হয়ে দেখা দেয়। এই ছন্দটি বিশ্বের নিত্যবস্তু; এই ছন্দের ঐক্যসূত্রেই তথ্যের মধ্যে আমরা সত্যের আনন্দ পাই। এই বিশ্বছন্দের দ্বারা উদ্ভাসিত না হলে তথ্য আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

গোধূলিবেলায় একটি বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, এই তথ্যটি মাত্র আমাদের কাছে অতি সামান্য। এই সংবাদমাত্রের দ্বারা এই ছবিটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, আমরা শুনেও শুনি নে; একটি চিরন্তন এক-রূপে এটি আমাদের চিত্তে স্থান পায় না। যদি কোনো নাছোড়বান্দা বক্তা আমাদের মনোযোগ জাগাবার জন্যে এই খবরটির পুনরাবৃত্তি করে, তা হলে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, “না হয় বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, তাতে আমার কী।’ অর্থাৎ, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ অনুভব করি নে ব'লে এ ঘটনাটি আমার কাছে সত্যই নয়। কিন্তু, যে-মুহূর্তে ছন্দে সুরে উপমার যোগে এই সামান্য কথাটাই একটি সুষমার অখণ্ড ঐক্যে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল অমনি এ প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেল যে, “তাতে আমার কী।’ কারণ, সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই নে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই। গোধূলিবেলায় বালিকা মন্দির হতে বাহির হয়ে এল, এই কথাটিকে তথ্য হিসাবে যদি সম্পূর্ণ করতে হত তা হলে হয়তো আরো অনেক কথা বলতে হত; আশপাশের অধিকাংশ খবরই বাদ গিয়াছে। কবি হয়তো বলতে পারতেন, সে সময়ে বালিকার খিদে পেয়েছিল এবং মনে মনে মিষ্টান্নবিশেষের কথা চিন্তা করছিল। হয়তো সেই সময়ে এই চিন্তাই বালিকার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। কিন্তু, তথ্য সংগ্রহ কবির কাজ নয়। এইজন্যে খুব বড়ো বড়ো কথাই ছাঁটা পড়েছে। সেই তথ্যের বাহুল্য বাদ পড়েছে ব'লেই সংগীতের বাঁধনের ছোটো কথাটি এমন একত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কবিতাটি এমন অখণ্ড সম্পূর্ণ

হয়ে জেগেছে, পাঠকের মন এই সামান্য তথ্যের ভিতরকার সত্যকে এমন গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছে। এই সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।

যথার্থ গুণী যখন একটা ঘোড়া আঁকেন তখন বর্ণ ও রেখা সংস্থানের দ্বারা একটি সুষমা উদ্ভাবন ক'রে সেই ঘোড়াটিকে একটি সত্যরূপে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, তথ্যরূপে নয়। তার থেকে সমস্ত বাজে খুঁটিনাটির বিক্ষিপ্ততা বাদ পড়ে যায়, একখানা ছবি আপনার নিরতিশয় ঐক্যটিকে প্রকাশ করে। তথ্যগত ঘোড়ার বহুল আত্মত্যাগের দ্বারা তবে এই ঐক্যটি বাধামুক্ত বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হয়।

কিন্তু, তথ্যের সুবিধা এই যে, তার পরীক্ষা সহজ। ঘোড়ার ছবি যে ঠিক ঘোড়ার মতোই হয়েছে তা প্রমাণ করতে দেরি লাগে না। ঘোর অরসিক ঘোড়ার কানের ডগা থেকে আরম্ভ করে তার লেজের শেষ পর্যন্ত হিসাব করে মিলিয়ে দেখতে পারে। হিসাবে ত্রুটি হলে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে মার্কা কেটে দেয়। ছবিতে ঘোড়াকে যদি ঘোড়ামাত্রই দেখানো হয় তা হলে পুরাপুরি হিসাব মেলে। আর, ঘোড়া যদি উপলক্ষ হয় আর ছবিই যদি লক্ষ্য হয় তা হলে হিসাবের খাতা বন্ধ করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যখন ঘোড়ার পরিচয় দিতে চান তখন তাঁকে একটা শ্রেণীগত সত্যের আশ্রয় নিতে হয়। এই ঘোড়াটি কী। না, একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ। এইরকম ব্যাপক ভূমিকার মধ্যে না আনলে পরিচয় দেবার কোনো উপায় নেই।

সাহিত্যে ও আর্টেও একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ, সে বস্তু যদি এমন একটি রূপরেখাগীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে ক'রে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, তা হলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয়, তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।

জাপানি কোনো ওস্তাদের ছবিতে দেখেছিলুম, একটি মূর্তির সামনে সূর্য কিন্তু পিছনে ছায়া নেই। এমন অবস্থায় যে লম্বা ছায়া পড়ে, এ কথা শিশুও জানে। কিন্তু বস্তুবিদ্যার খবর দেবার জন্যে তো ছবির সৃষ্টি নয়। কলা-রচনাতেও যারা ভয়ে ভয়ো তথ্যের মজুরি করে তারা কি ওস্তাদ।

অতএব, রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে, তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়। একটা ছেলে-ভোলানো ছড়া থেকে এর উদাহরণ দিতে চাই –

খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।

জুতা জিনিসটা তথ্যের কোঠায় পড়ে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। চীনে মুচির দোকানে নগদ কড়ি দিলেই মাপসই জুতা পছন্দসই আকারে পেতে সবাই পারে। কিন্তু, জুতুয়া? চীনেম্যান দূরে থাক্, বিলিতি দোকানের বড়ো ম্যানেজারও তার খবর রাখে না। জুতুয়ার খবর রাখে মা, আর রাখে খোকা। এইজন্যই এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে হবে ব'লে জুতা শব্দের ভদ্রতা নষ্ট করতে হল। তাতে আমাদের শব্দাম্বুধি বিক্ষুব্ধ হতে পারে, কিন্তু তথ্যের জুতা সত্যের মহলে চলে না ব'লেই ব্যাকরণের আক্রোশকেও উপেক্ষা করতে হয়।

কবিতা যে-ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধাননির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।

জ্ঞানদাসের একটি পদ মনে পড়ছে –

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল,
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।

তথ্যবাগীশ এই কবিতা শুনে কী বলবেন। ডুবেই যদি মরতে হয় তো জলের পাথার আছে; রূপের পাথার বলতে কী বোঝায়। আর, চোখ যদি ডুবেই যায় তবে রূপ দেখবে কী দিয়ে। আবার যৌবনের বন কোন্ দেশের বন। সেখানে পথ পায়ই বা কে আর হারায়ই বা কী উপায়ে। যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে-তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র ক'রে নানা ফাঁকে, নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে। দুর্গের পাথরের গাঁথুনি দেখাবার কাজ তো কবির নয়।

যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কী দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্ছে এই –

একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তীনগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিলে ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিলে রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে প'ড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানা জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথপিণ্ডদ বললেন, "অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিলল, আমি ধন্য হলুম।"

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা প'ড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন; বলেছিলেন, "এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়।" এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি-বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি,

একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তাহলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন-কি, আমার মতো কবি যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না এবং তথ্যের জগতে পাগলা-গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানিমাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত; কিন্তু, সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন ক'রে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না – সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ ক'রে অনায়াসে পার হয়ে যায়; তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো। এমনি উলটো-পালটা কাণ্ড।

তথ্যজগতে একজন ভালো ডাক্তার সব হিসাবেই খুব যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু, তাঁর পয়সা এবং পসার যতই অপর্যাপ্ত হোক-না কেন, তার উপরে চোদ্দ লাইনের কবিতা লেখাও চলে না। নিতান্ত যে উমেদার সে যদি বা লিখে বসে তাহলে বড়ো ডাক্তারের সঙ্গে যোগ থাকা সত্ত্বেও চোদ্দ দিনও সে কবিতার আয়ুরক্ষা হয় না। অতএব, রসের জগতের আলোকরশ্মি এতবড়ো ডাক্তারের মধ্যে দিয়েও পার হয়ে যায়। কিন্তু, এই ডাক্তারকে যে তার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে ভালোবেসেছে তার কাছে ডাক্তার রসবস্তু হয়ে প্রকাশ পায়। হবামাত্র ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে তার প্রেমাসক্ত অনায়াসে বলতে পারে –

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন ন তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন ন গেল।

আঙ্কিক বলছেন, লাখ লাখ যুগ পূর্বে ডারুয়িনের মতে ডাক্তারের পূর্বতন সত্তা যে কী ছিল সে কথা উত্থাপন করা নীতিবিরুদ্ধ না হলেও রুচিবিরুদ্ধ। যা হোক, সোজা কথা হচ্ছে, ডাক্তারের কুষ্ঠিতে লাখ লাখ যুগের অঙ্কপাত হতেই পারে না।

তর্ক করা মিছে, কারণ শিশুও এ কথা জানে। ডাক্তার যে সে তো সেদিন জন্মেছে; কিন্তু বন্ধু যে সে নিত্যকালের হৃদয়ের ধন। সে যে কোনো-এক কালে ছিল না, আর কোনো-এক কালে থাকবে না, সে কথা মনেও করতে পারি নে।

জ্ঞানদাসের দুটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ছে –

> এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই,
> রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই।

এক-দুইয়ের ক্ষেত্র হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। কিন্তু, রসসত্যের ক্ষেত্রে যে-প্রাণের আরতি বাড়তে থাকে সে তো অঙ্কের হিসাবে বাড়ে না। সেখানে এক-দুইয়ের বালাই নেই, নামতার দৌরাত্ম নেই।

অতএব, কাব্যের বা চিত্রের ক্ষেত্রে যারা সার্ভে-বিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের চার দিকে তথ্যের সীমানা এঁকে পাকা পিল্‌পে গেঁথে তুলতে চায়, গুণীরা চিরকাল তাদের দিকে তাকিয়ে বিধাতার কাছে দরবার করেছে –

> ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।
> অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ॥

> বিধি হে, যত তাপ মোর দিকে হানিবে, অবিচল রব তাহে।
> রসের নিবেদন অরসিকে ললাটে লিখো না হে, লিখো না হে॥

সৃষ্টি

আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব ব'লে যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন শুনতে পেলুম, আমাদের পাড়ার গলিতে সানাই বাজছে। কী জানি কোন্ বাড়িতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।

উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে। সে কেবল সুরের লেপ দিয়ে প্রত্যহের সমস্ত ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়। যেন আপিসের প্রয়োজনে লৌহপথে কুশ্রীতার রথযাত্রা চলছে না, যেন দরদাম কেনাবেচা ও-সমস্ত কিছুই না। সব ঢেকে দিলে।

ঢেকে দিলে কথাটা ঠিক হল না; পর্দাটা তুলে দিলে – এই ট্রাম চলাচলের, কেনা-বেচার, হাঁক-ডাকের পর্দা। বরবধূকে নিয়ে গেল নিত্যকালের অন্তঃপুরে, রসলোকে।

তুচ্ছতার সংসারে, কেনাবেচার জগতে, বরবধূরাও তুচ্ছ; কেই বা জানে তাদের নাম, কেই বা তাদের আসন ছেড়ে দেয়। কিন্তু, রসের নিত্যলোকে তারা রাজারানী। চারিদিকের ছোটো বড়ো সমস্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কিংখাবের সিংহাসনে তাদের বরণ করে নিতে হবে। প্রতিদিন তারা তুচ্ছতার অভিনয় করে, এইজন্যেই প্রতিদিন তারা ছায়ার মতো অকিঞ্চিৎকর। আজ তারা সত্যরূপে প্রকাশমান; তাদের মূল্যের সীমা নেই; তাদের জন্যে দীপমালা সাজানো, ফুলের ডালি প্রস্তুত, বেদমন্ত্রে চিরন্তন কাল তাদের আশীর্বাদ করবার জন্যে উপস্থিত।

এই বরবধূ, এই দুটি মানুষ যে সত্য, কোনো রাজা-মহারাজের চেয়ে কম সত্য নয়, সমস্ত সংসার তাদের এই পরিচয়টি গোপন করে রাখে। কিন্তু, সেই নিত্যপরিচয় প্রকশ করবার ভার নিয়েছে বাঁশি। মনে করো-না কেন, এক কালে তপোবনে থাকত একটি মেয়ে; সেদিনকার হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে সেও ছিল সামান্যতার কুহেলিকায় ঢাকা।

তাকে দেখে একদিন রাজার মন ভুলেছিল, আর-একদিন রাজা তাকে ত্যাগ করেছিল। সেদিন এমন কত ঘটেছে তার খবর কে রাখে। তাই তো রাজা নিজেকে লক্ষ্য করে বলেছে, “সকৃৎকৃতপ্রণয়োহং জনঃ।’ রাজার সকৃৎপ্রণয়ের প্রাত্যহিক উচ্ছিষ্টদের লক্ষ্য ক’রে দেখবার, মনে ক’রে রাখবার, এত সময় আছে কার। কাজকর্ম তো থেমে থাকে না, কেনাবেচা তো চলছেই, হাটের মধ্যে যে ঠেলাঠেলি ভিড়। সেই সংসারের পথে হংসপদিকাদের পদচিহ্ন কোথাও পড়ে না, তাদের ঠেলে সরিয়ে ফেলে জীবনযাত্রার অসংখ্য যাত্রী ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। কিন্তু, একটি তপোবনের বালিকাকে অসংখ্যের তুচ্ছলোক থেকে একের সত্যলোকে সুস্পষ্ট ক’রে দাঁড় করালে কে। সেও একটি কবির বাঁশি। যে সত্য প্রতিদিন ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি ও দরদামের হট্টগোলের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে, খাম্বাজের করুণ রাগিনী আমাদের গলির মোড়ে সেই সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে সুরের অমৃত বর্ষণ করছে।

তথ্যের সংকীর্ণতার থেকে মানুষ যেমনি সত্যের অসীমতায় প্রবেশ করে অমনি তার মূল্যের কত পরিবর্তন হয়, সে কি আমরা দেখি নে। রাখাল যখন ব্রজের রাখাল হয়ে দেখা দেয় তখন কি মথুরার রাজপুত্র ব’লে তার মূল্য। তখন কি তার পাঁচনির মহিমা গদাচক্রের চেয়ে কম। তার বাঁশি কি পাঞ্চজন্যের কাছে লজ্জা পায়। সত্য যে সে কি মণিমালা ফেলে দিয়ে বনফুলের মালা পড়তে কুণ্ঠিত। সেই রাখালবেশের সত্যকে প্রকাশ করতে পারে কে। সে তো কবির বাঁশি। রাজাধিরাজ মহারাজ নিজের মহিমা প্রকাশ করবার জন্যে কী আয়োজনই না করলে। তবু আজ বাদে কাল সেই বিপুল আয়োজনের বোঝা নিয়ে ঝঞ্ঝাশেষের মেঘের মতো দিগন্তরালে সে যায় মিলিয়ে। কিন্তু, সাহিত্যের অমরাবতীতে কলার নিত্য-নিকেতনে একটি পথের ভিক্ষু যে অখণ্ড সত্যে বিরাজ করে সেই সত্যের ক্ষয় নেই। রোমিয়ো-জুলিয়েটকে যখন সাহিত্যভূবনে দেখি তখন কোনো মূঢ় জিজ্ঞাসা করে না, ব্যাঙ্কে তাদের কত টাকা জমা আছে, ষড়্‌দর্শনে তাদের ব্যুৎপত্তি কতদূর, এমন-কি, দেবদ্বিজে তারা ভক্তিমান কি না এবং নিত্য নিয়মিত সান্ধ্যাহ্নিকে তাদের কী পরিমাণ নিষ্ঠা। তারা সত্য এইমাত্র তাদের মহিমা; সাহিত্য সেই কথাই প্রমাণ করে। সেই সত্যে যদি তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে, অথচ নায়ক নায়িকা দোঁহে মিলে যদি দশাবতারের সুনিপুণ

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা গীতার শ্লোক থেকে দেশাত্মবোধের আশ্চর্য অর্থ উদ্‌ঘাটন করতে পারে, তবু তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

শুধু কেবল মানুষ কেন, অজীব সামগ্রীকে যখন আমরা কাব্যকলার রথে তুলে তথ্যসীমার বাহিরে নিয়ে যাই তখন সত্যের মূল্যে সে মূল্যবান হয়ে ওঠে। কলকাতায় আমার এক কাঠা জমির দাম পাঁচ-দশ হাজার টাকা হতে পারে, কিন্তু সত্যের রাজত্বে সেই দামকে আমরা দাম বলেই মানি নে – সে দাম সেখানে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়। বৈষয়িক মূল্য সেখানে পরিহাসের দ্বারা অপমানিত। নিত্যলোকে রসলোকে তথ্যবন্ধন থেকে মানুষের এই-যে মুক্তি এ কি কম মুক্তি। এই মুক্তির কথা আপনাকে আপনি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে মানুষ গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে; আপন সত্য ঐশ্বর্যকে হাটবাজার থেকে বাঁচিয়ে এনে সুন্দরের নিত্য ভাণ্ডারে সাজিয়ে রেখেছে। আপনাকে আপনি বার বার বলেছে, “ঐ আনন্দলোকেই তোমার সত্য প্রকাশ।’

আমি কী বোঝাব তোমাদের কাকে বলে সাহিত্য, কাকে বলে চিত্রকলা। বিশ্লেষণ ক’রে কি এর মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারি। কোন্ আদি উৎস থেকে এর স্রোতের ধারা বাহির হয়েছে এক মুহূর্তে তা বোঝা যায়, যখন সেই স্রোতে মন আপনার গা ভাসিয়ে দেয়। আজ সেই বাঁশির সুরে যখন মন ভেসেছিল তখন বুঝেছিলেম, বুঝিয়ে দেবার কথা এর মধ্যে কিছু নেই; এর মধ্যে ডুব দিলেই সব সহজ হয়ে আসে। নীলাকাশের ইশারা আমাদের প্রতিদিন বলেছে, “আনন্দধামের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ।’ এ কথা বলেছে, বসন্তের হাওয়ায় বিরহের মরমিয়া কবি। সকালবেলায় প্রভাতকিরণের দূত এসে ধাক্কা দিল। কী। না, নিমন্ত্রণ আছে। উদাস মধ্যাহ্নে মধুকরগুঞ্জিত বনচ্ছায়া দূত হয়ে এসে ধাক্কা দিল, নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যামেঘে অস্তসূর্যচ্ছটায় সে দূত আবার বললে, নিমন্ত্রণ আছে। এত সাজসজ্জা এই দূতের, এত ফুলের মালা, এত গৌরবের মুকুট। কার জন্যে। আমার জন্যে। আমি রাজা নই, জ্ঞানী নই, গুণী নই – আমি সত্য, তাই আমার জন্য সমস্ত আকাশের রঙ নীল ক’রে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক’রে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল ক’রে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হবে না কি। সে

উত্তর ঐ আনন্দধামের বাণীতেই যদি না লিখি তাহলে কি গ্রাহ্য হবে। মানুষ তাই মধুর করেই বললে, "আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল; হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার ক'রে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর ক'রে তোমাকে চিঠি পাঠাব, যেমন ক'রে তুমি পাঠালে। যেমন তুমি তোমার অনির্বাণ তারকার প্রদীপ জ্বেলে তোমার দূতের হাতে দিয়েছ, আমাকেও তেমনি করে আলো জ্বালতে হবে যে-আলো নেবে না, মালা গাঁথতে হবে যে-মালা শুকোতে জানে না। আমি মানুষ, আমার ভিতর যদি অনন্তের শক্তি থাকে তবে সেই শক্তির ঐশ্বর্য দিয়েই তোমার আমন্ত্রণের উত্তর দেব।' মানুষ এমন কথা সাহস করে বলেছে, এতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব।

আজ যখন আমাদের গলিতে বরবধূর সত্যস্বরূপ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ প্রকাশ করবার ভার নিলে ঐ বাঁশি, তখন আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেম, কী মন্ত্রে বাঁশি আপনার কাজ সমাধা করে। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানী তো বলে, অনিশ্চিতের দোলায় সমস্ত সংসার দোদুল্যমান; বলে, যা দেখ কিছুই সত্য নয়। আমাদের নীতিনিপুণ বলে, ঐ যে ললাটে ওরা চন্দন পড়েছে, ও তো ছলনা, ওর ভিতরে আছে মাথার খুলি। ঐ-যে মধুর হাসি দেখতে পাচ্ছ, ঐ হাসির পর্দা তুলে দেখো, বেরিয়ে পড়বে শুকনো দাঁতের পাটি। বাঁশি তর্ক ক'রে তার কোনো জবাব দেয় না; কেবল তার খাম্বাজের সুরে বলতে থাকে, খুলি বল, দাঁতের পাটি বল, যত কালই টিঁকে থাক্-না কেন, ওরা মিছে; কিন্তু ললাটে যে আনন্দের সুগন্ধলিপি আছে, মুখে যে লজ্জার হাসির আভা দিচ্ছে, যা এখন আছে তখন নেই, যা ছায়ার মতো মায়ার মতো, যাকে ধরতে গেলে ধরা যায় না, তাই সত্য, করুণ সত্য, মধুর সত্য, গভীর সত্য। সেই সত্যকেই সংসারের সমস্ত আনাগোনার উপরে উজ্জ্বল ক'রে ধরে বাঁশি বলছে, "সত্যকে যেদিন প্রত্যক্ষ দেখবে সেই দিনই উৎসব।'

বুঝলুম। কিন্ত, বিনা তর্কে বাঁশি এতবড়ো কথাটাকে সপ্রমাণ করে কী করে। এ কথাটা কাল আলোচনা করেছিলুম। বাঁশি একের আলো জ্বালিয়েছে। আকাশে রাগিণী দিয়ে এমন একটি রূপের সৃষ্টি করেছে যার আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই, কেবল ছন্দে সুরে

সুসম্পূর্ণ এককে চরমরূপে দেখানো। সেই একের জিয়নকাঠি যার উপরে পড়ল আপনার মধ্যে গভীর নিত্যসত্যের চিরজাগ্রতের চিরসজীব স্বরূপটি সে দেখিয়ে দিলে; বরবধূ বললে, “আমরা সামান্য নই, আমরা চিরকালের।’ বললে, “মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যারা আমাদের দেখে তারা মিথ্যা দেখে। আমরা অমৃতলোকের, তাই গান ছাড়া আমাদের পরিচয় আর কিছুতে দিতে পারি না।’ বরকনে আজ সংসারের স্রোতে ভাসমান খাপছাড়া পদার্থ নয়; আজ তারা মধুরের ছন্দে একখানি কবিতার মতো, গানের মতো, ছবির মতো আপনাদের মধ্যে একের পরিপূর্ণতা দেখাচ্ছে। এই একের প্রকাশতত্ত্বই হল সৃষ্টির তত্ত্ব, সত্যের তত্ত্ব।

সংগীত কোনো-একটি রাগিণীতে যতই রমণীয় সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করুক-না কেন, সাধারণ ভাষায় এবং বাহিরের দিক থেকে তাকে অসীম বলা যায় না। রূপের সীমা আছে। কিন্তু, রূপ যখন সেই সীমামাত্রকে দেখায় তখন সত্যকে দেখায় না। তার সীমাই যখন প্রদীপের মতো অসীমের আলো জ্বালিয়ে ধরে তখনি সত্য প্রকাশ পায়।

আজকেকার সানাই বাজনাতেই এ কথা আমি অনুভব করছি। প্রথম দুই-একটা তালের পরই বুঝতে পারলুম, এ বাঁশিটা আনাড়ির হাতে বাজছে, সুরটা খেলো সুর। বার বার পুনরাবৃত্তি, তার স্বরের মধ্যে কোথাও সুরের নম্রতা নেই, তরুহীন মাটির মধ্যে ছায়াহীন মধ্যাহ্নরৌদ্রের মতো। যত ঝোঁক সমস্তই আওয়াজের প্রখরতার উপর। সংগীতের আয়তনটাকেই বড়ো ক’রে তোলবার দিকে বলবান প্রয়াস। অর্থাৎ, সীমা এখানে আপনাকেই বড়ো করে দেখাতে চাচ্ছে – তারই ‘পরে আমাদের মন না দিয়ে উপায় নেই। তার চরমকে সে আপনার পালোয়ানির দ্বারা ঢেকে ফেলছে। সীমা আপন সংযমের দ্বারা আপনাকে আড়াল ক’রে সত্যকে প্রকাশ করে। সেইজন্যে সকল কলাসৃষ্টিতেই সরলতার সংযম একটা প্রধান বস্তু। সংযমই হচ্ছে সীমার তর্জনী দিয়ে অসীমকে নির্দেশ করা। কোনো জিনিসের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংযম। সেটাই হল একের বিরুদ্ধে অনেকের বিদ্রোহ। সেই বাহ্য অনেকের পরিমাণ যতই বড়ো হতে থাকে অন্তর্যামী এক ততই আচ্ছন্ন হয়। যিশু

বলেছেন, “বরঞ্চ উট ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে গলতে পারে কিন্তু ধনের আতিশয্য নিয়ে কোনো মানুষ দিব্যধামে প্রবেশ করতে পারে না।’ তার মানে হচ্ছে, অতিমাত্রায় ধন জিনিসটা মানুষের বাহ্য অসংযম। উপকরণের বাহুল্য দ্বারা মানুষ আত্মার সুসম্পূর্ণ ঐক্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। তার অধিকাংশ চিন্তা চেষ্টা খণ্ডিত ভাবে বহুল সঞ্চয়ের মধ্যে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। যে- এক সম্পূর্ণ, যে-এক সত্য, যে-এক অসীম, আপনার মধ্যে তার প্রকাশকে ধনী বহুবিচিত্রের মধ্যে ছড়াছড়ি ক’রে নষ্ট করে। জীবন-বাঁশিতে সেই তো খেলো সুর বাজায় – তানের অদ্ভুত কসরত, দুন-চৌদুনের মাতামাতি, তারস্বরের অসহ্য দাম্ভিকতা। এতেই অরসিকের চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। রূপের সংযমের মধ্যে যারা সত্যের পূর্ণরূপ দেখতে চায় তারা রূপের জঙ্গলের প্রবলতার দস্যুবৃত্তি দেখে পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায়। সেখানে রূপ হাঁক দিয়ে দিয়ে বলে, “আমাকে দেখো।’ কেন দেখব। জগতে রূপের সিংহাসনে অরূপকে দেখব বলেই এসেছি। কিন্তু, জগতে বিজ্ঞান যেমন অবস্তুকে খুঁজে বের করে বলছে “এই তো সত্য’, রূপজগতে কলা তেমনি অরূপ রসকে দেখিয়ে বলছে “ঐ তো আমার সত্য’। যখন দেখলুম সেই সত্য তখন রূপ আর আমাকে লোভ দেখাতে পারে না, তখন কসরতকে বলি “ধিক্’ ।

পেটুক মানুষের যখন পেটের ক্ষুধা ঘোচে তখনো তার মনের ক্ষুধা ঘোচে না। মেয়েরা খুশি হয়ে তার পাতে যত পারে পিটেপুলি চাপাতে থাকে। অবশেষে একদিন অম্লশূলরোগীর সেবার জন্য সেই মেয়েদের ‘পরেই ডাক পড়ে। সাহিত্যকলার ক্ষেত্রে যারা পেটুক তারাই রূপের লোভে অতিভোগের সন্ধান করে – তাদের মুক্তি নেই। কারণ, রূপের মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হলে সত্য সেই রূপ থেকেই মুক্তি দেয়। যারা ফর্মা গণনা ক’রে পুঁথির দাম দেয় তাদের মন পুঁথি চাপা পড়ে কবরস্থ হয়।

কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে – রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা; অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন ক’রে দেখা; ঈশোপনিষদের সেই বাণীটিকে গ্রহণ করা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত ক’রে দেখা, এবং মা গৃধঃ – লোভ কোরো না – এই অনুশাসন গ্রহণ করা। সৃষ্টির তত্ত্বই এই; জগৎসৃষ্টিই বল আর কলাসৃষ্টিই বল।

রূপকে মানতেও হবে, না'ও মানতে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে। রূপের প্রতি লোভ না থাকে যেন।

এই যে আমাদের একটা আশ্চর্য দেহ, এর ভিতরে আশ্চর্য কতকগুলো কল – হজম করবার কল, রক্তচালনার কল, নিশ্বাস নেবার কল, চিন্তা করবার কল। এই কলগুলোর সম্বন্ধে ভগবানের যেন বিষম একটা লজ্জা আছে। তিনি সবগুলোই খুব ক'রে ঢাকা দিয়েছেন। আমরা মুখের মধ্যে খাবার পুরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাই এ কথাটাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের আগ্রহ নেই। আমাদের মুখ ভাবের লীলাভূমি, অর্থাৎ মুখে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা রক্তমাংসের অতীত, যা অরূপ ক্ষেত্রের; এইটেতেই মুখের মুখ্য পরিচয়। মাংসপেশী খুবই দরকারি, তার বিস্তর কাজ, কিন্তু মুগ্ধ হলুম কখন। যখন আমাদের সমস্ত দেহের সংগীতকে তারা গতিলীলায় প্রকাশ করে দেখালে। মেডিকেল কলেজে যারা দেহ বিশ্লেষণ ক'রে শরীরতত্ত্ব জেনেছে সৃষ্টিকর্তা তাদের বলেন, "তোমাদের প্রশংসা আমি চাই নে।' কেননা, সৃষ্টির চরমতা কৌশলের মধ্যে নেই। তিনি বলেন, "জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রীরূপে আমি যে ভালো এঞ্জিনিয়ার এটা নাই বা জানলে।' তবে কী জানব। "আনন্দরূপে আমাকে জানো।' ভূস্তরসংস্থানে বড়ো বড়ো পাথরের শিলালিপিতে তার নির্মানের ইতিহাস গুপ্ত অক্ষরে খোদিত আছে। মাটির উপর মাটি দিয়ে সে সমস্তই বিধাতা চাপা দিয়েছেন। কিন্তু, উপরটিতে যেখানে প্রাণের নিকেতন, আনন্দনিকেতন, সেইখানেই তাঁর সূর্যের আলো চাঁদের আলো ফেলে কত লীলাই চলছে তার সীমা নেই। এই ঢাকাটা যখন ছিল না তখন সে কী ভয়ংকর কাণ্ড। বিশ্বকর্মার কী হাতুড়ি-ঠোকাঠুকি, বড়ো বড়ো চাকার সে কী ঘুরপাক, কী অগ্নিকুণ্ড, কী বাষ্পনিশ্বাস। তারপরে কারখানাঘরের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে, সবুজ নীল সোনার ধারায় সমস্ত ধুয়ে মুছে দিয়ে, তারার মালা মাথায় প'রে, ফুলের পাদপীঠে পা রেখে, তিনি আনন্দে রূপের আসন গ্রহণ করলেন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে পড়ল। পৃথিবীর যে-সভ্যতা তাল ঠুকে মাংসপেশীর গুমর ক'রে পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, কারখানাঘরের চোঙাগুলোকে

ধূমকেতুর ধ্বজদণ্ড বানিয়ে আলোকের আঙিনায় কালি লেপে দিচ্ছে, সেই বেআব্রুসভ্যতার 'পরে সৃষ্টিকর্তার লজ্জা দেখতে পাচ্ছ না কি। ঐ বেহায়া যে আজ দেশে বিদেশে আপন দল জমিয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াচ্ছে। নিউইয়র্ক থেকে টোকিও পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে, ঘাটিতে ঘাটিতে, তার উদ্ধত যন্ত্রগুলো উৎকট শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা সৃষ্টির মঙ্গলশঙ্খধ্বনিকে ব্যঙ্গ করছে। উলঙ্গশক্তির এই দৃপ্ত আত্মম্ভরিতা আপন কলুষ-কুৎসিত মুষ্টিতে অমৃতলোকের সম্মান লুট করে নিতে চায়। মানবসংসারে আজকের দিনের সবচেয়ে মহৎ দুঃখ, মহৎ আপমান এই নিয়েই।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিকর্তা। আজকের দিনের সভ্যতা মানুষকে মজুর করছে, মিস্ত্রি করছে, মহাজন করছে, লোভ দেখিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে খাটো করে দিচ্ছে। মানুষ নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়। ব্যবসায়ের প্রয়োজন যখন অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠতে থাকে তখন আত্মার বাণী নিরস্ত হয়ে যায়। ধনী তখন দিব্যধামের পথের চিহ্ন লোপ করে দেয়, সকল পথকেই হাটের দিকে নিয়ে আসে।

কোন্‌খানে মানুষের শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ বাহ্য প্রকৃতির তথ্য-রাজ্যের সীমা অতিক্রম ক'রে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায় – যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ, তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব লাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্যে সমগ্র মানুষের তপস্যা। যেখানে মহাসাধকেরা সাধন করছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাবীরেরা প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন প্রত্যেক মানুষের জন্যে। যেখানে একজন ধনী দশ জনকে শোষণ করছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ ক'রে একজন শক্তিশালী হচ্ছে, যেখানে বহু লোকের ক্ষুধার অন্ন একজন লোকের ভোগবাহুল্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মানুষের সত্যরূপ, শান্তিরূপ আপন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল না।

যে মানুষ লোভী চিরদিনই সে নির্লজ্জ; যে লোক শক্তির অভিমানী, সত্যযুগেও নিখিলের সঙ্গে আপন অসামঞ্জস্য নিয়েই সে দম্ভ করেছে। কিন্তু সেকালে তার লজ্জাহীনতাকে, তার দম্ভকে তিরস্কৃত করবার লোক ছিল। মানুষ সেদিন লোভীকে, শক্তিশালীকে, এ কথা বলতে কুণ্ঠিত হয় নি – "পৃথিবীতে সুন্দরের বাণী এসেছে, তুমি তাতে বেসুর লাগিয়ো না; জগতে আনন্দলক্ষ্মীর যে সিংহাসন সে যে শতদল পদ্ম, মত্ত করীর মতো তাকে দলতে যেয়ো না।' এই কথাই বলছে কবির কাব্য, চিত্রীর চিত্রকলা। আজ বিবাহের দিনে বাঁশি বলছে, "বরবধূ, তোমরা যে সত্য এই কথাটাই অন্য সকল কথার চেয়ে বড়ো করে আপনাদের মধ্যে প্রকাশ করো। লাখ দু-লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমছে বলেই যে সত্য তা নয়; যে-সত্যের বাণী আমি ঘোষণা করি সে-সত্য বিশ্বের ছন্দের ভিতর, চেক-বইয়ের অঙ্কের মধ্যেই নয়। সে-সত্য পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অমৃত সম্বন্ধে – গৃহসজ্জার উপকরণে নয়। সেই হচ্ছে সম্পূর্ণের সত্য, একের সত্য।'

আজ আমি সাহিত্যের কারুকারিতা সম্বন্ধে, তার ছন্দতত্ত্ব, তার রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব মনে স্থির করেছিলুম। এমন সময় বাজল বাঁশি। ইন্দ্রদেব সুন্দরকে দিয়ে বলে পাঠালেন, "ব্যাখ্যা করেই যে সব কথা বলা যায়, আর তপস্যা করেই যে সব সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় এমন-সব লোক-প্রচলিত কথাকে তুমি কি কবি হয়েও বিশ্বাস কর। ব্যাখ্যা বন্ধ ক'রে তপস্যা ভঙ্গ ক'রে যে ফল পাওয়া যায় সেই হল অখণ্ড। সে তৈরি-করা জিনিস নয়, সে আপনি ফলে-ওঠা জিনিস।' ধর্মশাস্ত্রে বলে, ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্যেই মধুরকে পাঠিয়ে দেন। আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করি নে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কিরকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন। বলেন, "এ জিনিস লড়াই ক'রে তৈরি ক'রে তোলবার জিনিস নয়; এ ক্রমে ক্রমে থাকে থাকে গ'ড়ে ওঠে না। সত্য সুরে গানটিকে যদি সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে চাও, তা হলে রাতদিন বাঁও-কষাকষি ক'রে তা হবে না। তম্বুরার এই খাঁটি মধ্যম-পঞ্চম সুরটিকে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করো এবং অখণ্ড সম্পূর্ণতাটিকে অন্তরে লাভ করো, তা হলে সমগ্র গানের ঐক্যটি সত্য হবে।' মেনকা উর্বশী এরা হল ঐ তম্বুরার মধ্যম-পঞ্চম সুর – পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা। সন্ন্যাসীকে মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধির ফল জিনিসটা কী

রকমের। স্বর্গকামী, তুমি স্বর্গ চাও? তাই তোমার তপস্যা? কিন্তু, স্বর্গ তো পরিশ্রম ক'রে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি হয় নি। স্বর্গ যে সৃষ্টি। উর্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে-হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে। তুমি মুক্তিকামী, মুক্তি চাও? একটু একটু ক'রে অস্তিত্বের জাল ছিঁড়ে ফেলাকে তো মুক্তি বলে না। মুক্তি তো বন্ধনহীন শূণ্যতা নয়। মুক্তি যে সৃষ্টি। মেনকার কবরীতে যে-পারিজাত ফুলটি রয়েছে তার দিকে চেয়ে দেখো, মুক্তির পূর্ণরূপের মূর্তিটি দেখতে পাবে। বিধাতার রুদ্ধ আনন্দ ঐ পারিজাতের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে – সেই অরূপ আনন্দ রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ ক'রে সম্পূর্ণ হয়েছে।

বুদ্ধদেব যখন বোধিদ্রুমের তলায় ব'সে কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন তখন তাঁর পীড়িত চিত্ত বলেছে, "হল না', "পেলুম না'। তাঁর পাওয়ার পূর্ণ রূপের প্রতিমা বাইরে দেখতে পেলেন কখন। যখন সুজাতা অন্ন এনে দিলে। সে কি কেবল দেহের অন্ন। তার মধ্যে যে ভক্তি ছিল, প্রীতি ছিল, সেবা ছিল, সৌন্দর্য ছিল – সেই পায়স-অন্নের অমৃত অতি সহজে প্রকাশ পেল। ইন্দ্রদেব কি সুজাতাকে পাঠান নি। সেই সুজাতার মধ্যেই কি অমরাবতীর সেই বাণী ছিল না যে, কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তি নেই, মুক্তি আছে প্রেমে। সেই ভক্তহৃদয়ের অন্ন-উৎসর্গের মধ্যে মাতৃপ্রাণের যে-সত্য ছিল সেই সত্যটি থেকেই কি বুদ্ধ বলেন নি "এক পুত্রের প্রতি মাতার যে-প্রেম সেই অপরিমেয় প্রেমে সমস্ত বিশ্বকে আপন ক'রে দেখাকেই বলে ব্রহ্মবিহার'? অর্থাৎ, মুক্তি শূন্যতায় নয়, পূর্ণতায়; এই পূর্ণতাই সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে না।

মানবাত্মার যে প্রেম অসীম আত্মার কাছে আপনাকে একান্ত নিবেদন ক'রে দিয়েই আনন্দ পায়, তার চেয়ে আর কিছুই চায় না, যিশুখৃষ্ট তারই সহজ স্বরূপটিকে বাহিরের মূর্তিতে কোথায় দেখেছিলেন। ইন্দ্রদেব আপন সৃষ্টি থেকে এই মূর্তিটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। মার্থা আর ম্যারি দুজনে তাঁর সেবা করতে এসেছিল। মার্থা ছিল কর্তব্যপরায়ণা, সেবার কঠোরতায় সে নিত্যনিয়ত ব্যস্ত। ম্যারি সেই ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে আত্মনিবেদনের পূর্ণতাকে বহু প্রয়াসে প্রকাশ করে নি। সে আপন বহুমূল্য গন্ধতৈল খৃষ্টের পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিলে। সকলে বলে উঠল, "এ যে অন্যায় অপব্যয়।' খৃষ্ট

বললেন, “না, না, ওকে নিবারণ কোরো না। সৃষ্টিই কি অপব্যয় নয়। গানে কি কারো কোনো লাভ আছে। চিত্রকলায় কি অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হয়। কিন্তু, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ আপন পূর্ণতাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েই পূর্ণতার ঐশ্বর্য লাভ করে। সেই ঐশ্বর্য শুধু তার সাহিত্যে ললিতকলায় নয়, তার আত্মবিসর্জনের লীলাভূমি সমাজে নানা সৃষ্টিতেই প্রকাশ পায়। সেই সৃষ্টির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগিতায় নয়, মানবাত্মার পূর্ণ স্বরূপের বিকাশে – তা অহৈতুক, তা আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। যিশুখৃস্ট ম্যারির চরম আত্মনিবেদনের সহজ রূপটি দেখলেন; তখন তিনি নিজের অন্তরের পূর্ণতাকেই বাহিরে দেখলেন। ম্যারি যেন তাঁর আত্মার সৃষ্টিরূপেই তাঁর সম্মুখে অপরূপ মাধুর্যে প্রকাশিত হল। এমনি করেই মানুষ আপন সৃষ্টিকার্যে আপন পূর্ণতাকে দেখতে চাচ্ছে। কৃচ্ছ্রসাধনে নয়, উপকরণ সংগ্রহে নয়। তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোক – লক্ষপতির কোষাগার নয়, পৃথ্বীপতির জয়স্তম্ভ নয়। তাকে যেন লোভে না ভোলায়, দম্ভে অভিভূত না করে; কেননা সে সংগ্রহকর্তা নয়, নির্মাণকর্তা নয়, সে সৃষ্টিকর্তা।

১৩৩০

সাহিত্যধর্ম

কোটালের পুত্র, সওদাগরের পুত্র, রাজপুত্র, এই তিনজনে বাহির হন রাজকন্যার সন্ধানে। বস্তুত রাজকন্যা ব'লে যে একটা সত্য আছে তিন রকমের বুদ্ধি তাকে তিন পথে সন্ধান করে।

কোটালের পুত্রের ডিটেক্‌টিভ-বুদ্ধি, সে কেবল জেরা করে। করতে করতে কন্যার নাড়ীনক্ষত্র ধরা পড়ে; রূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শরীরতত্ত্ব, গুণের আবরণ থেকে মনস্তত্ত্ব। কিন্তু এই তত্ত্বের এলেকায় পৃথিবীর সকল কন্যাই সমান দরের মানুষ – ঘুঁটেকুড়োনির সঙ্গে রাজকন্যার প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে-চক্ষে দেখেন সে-চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্নজিজ্ঞাসা।

আর-এক দিকে রাজকন্যা কাজের মানুষ। তিনি রাঁধেন বাড়েন, সুতো কাটেন, ফুলকাটা কাপড় বোনেন। এখানে সওদাগরের পুত্র তাঁকে যে চক্ষে দেখেন সে চক্ষে না আছে রস, না আছে প্রশ্ন; আছে মুনফার হিসাব।

রাজপুত্র বৈজ্ঞানিক নন – অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি – তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি, চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ। দুর্গম পথ পার হয়েছেন জ্ঞানের জন্যে না, ধনের জন্যে না, রাজকন্যারই জন্যে। এই রাজকন্যার স্থান ল্যাবরেটরিতে নয়, হাটবাজারে নয়, হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে যেখানে কাব্যের কল্পতায় ফুল ধরে। যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়। এই কলাজগতে যার প্রকাশ কোনো সমজদার তাকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে না, “তুমি কেন।' সে বলে, “তুমি যে তুমিই,এই আমার যথেষ্ট।' রাজপুত্রও রাজকন্যার কানে কানে

এই কথাই বলেছিলেন। এই কথাটা বলবার জন্যে সাজাহানকে তাজমহল বানাতে হয়েছিল।

যাকে সীমায় বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ণয় চলে; কিন্তু, যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই নে, বোধের মধ্যে পাই। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁকে না পাই মনে, না পাই বচনে, তাঁকে যখন পাই আনন্দবোধে, তখন আর ভাবনা থাকে না। – আমাদের এই বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা। সে এই বোধের দ্বারা আপনাকে জানে। যে-প্রেমে, যে-ধ্যানে, যে-দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায় সাহিত্যে, রূপকলায়।

দেয়ালে-বাঁধা খণ্ড আকাশ আমার আপিস-ঘরটার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেছে। কাঠা-বিঘের দরে তার বেচাকেনা চলে, তার ভাড়াও জোটে। তার বাইরে গ্রহতারার মেলা যে অখণ্ড আকাশে তার অসীমতার আনন্দ কেবলমাত্র আমার বোধে। জীবলীলার পক্ষে ঐ আকাশটাকে যে নিতান্তই বাহুল্য, মাটির নীচেকার কীট তারই প্রমাণ দেয়। সংসারে মানবকীটও আছে, আকাশের কৃপণতায় তার গায়ে বাজে না। যে-মনটা গরজের সংসারের গরাদের বাইরে পাখা না মেলে বাঁচে না সে-মনটা ওর মরেছে। এই মরা-মনের মানুষটারই ভূতের কীর্তন দেখে ভয় পেয়ে কবি চতুরাননের দোহাই পেড়ে বলেছিলেন –

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

কিন্তু, রূপকথার রাজপুত্রের মন তাজা। তাই নক্ষত্রের নিত্যদীপবিভাসিত মহাকাশের মধ্যে যে অনির্বচনীয়তা তাই সে দেখেছিল ঐ রাজকন্যায়। রাজকন্যার সঙ্গে তার ব্যবহারটা এই বোধেরই অনুসারে। অন্যদের ব্যবহার অন্যরকম। ভালোবাসায় রাজকন্যায় হৃৎস্পন্দন কোন্ ছন্দের মাত্রায় চলে তার পরিমাপ করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক অভাবপক্ষে একটা টিনের চোঙ ব্যবহার করতে একটুও পীড়া বোধ করেন না। রাজকন্যা

নিজের হাতে দুধের থেকে যে নবনী মন্থন ক'রে তোলেন সওদাগরের পুত্র তাকে চৌকো টিনের মধ্যে বদ্ধ ক'রে বড়োবাজারে চালান দিয়ে দিব্য মনের তৃপ্তি পান। কিন্তু, রাজপুত্র ঐ রাজকন্যার জন্যে টিনের বাজুবন্ধ গড়াবার আভাস স্বপ্নে দেখলেও নিশ্চয় দম আটকে ঘেমে উঠবেন। ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্তত চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে।

এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের।

অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা – তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার, কণ্ঠের সুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে। সেই বাণীর সংকেতঝংকারে বাজতে থাকে "অলম্' – অর্থাৎ, "বাস, আর কাজ নেই।' এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।

ইংরেজিতে যাকে ক্ষনতর বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ সত্য হল এক, আর সার্থক সত্য হল আর। সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই-করা। মানুষমাত্রেই সাধারণ সত্যের কোঠায়, কিন্তু যথার্থ মানুষ "লাখে না মিলল এক'। করুণার আবেগে বাল্মীকির মুখে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তখন সেই ছন্দকে ধন্য করবার জন্যে নারদঋষির কাছ থেকে তিনি একজন যথার্থ মানুষের সন্ধান করেছিলেন। কেননা, ছন্দ অলংকার। যথার্থ সত্য যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমর পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিত্তে, রূপকারের চিত্তে, এই যথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ ব'লে সত্যের সার্থকরূপ তিনি অনেক

ব্যাপক ক’রে দেখাতে পারেন। যে-জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিসই সার্থক। এক টুকরো কাঁকর আমার কাছে কিছুই নয়, একটি পদ্ম আমার কাছে সুনিশ্চিত। অথচ কাঁকর পদে পদে ঠেলে ঠেলে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে পড়লে তাকে ভোলবার জন্যে বৈদ্য ডাকতে হয়, ভাতে পড়লে দাঁতগুলো আঁৎকে ওঠে – তবু তার সত্যের পূর্ণতা আমার কাছে নেই। পদ্ম কনুই দিয়ে বা কটাক্ষ দিয়ে ঠেলাঠেলির উপদ্রব একটুও করে না, তবু আমার সমস্ত মন তাকে আপনি এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করে।

যে-মন বরণীয়কে বরণ ক’রে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই। সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য, এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারালো। বক ফুল, বেগুণের ফুল, কুমড়ো ফুল, এই-সব রইল কাব্যের বাহির-দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে। কবির কথা ছেড়ে দাও, কবির সীমন্তিনীও অলকে সজনেমঞ্জরি পরতে দ্বিধা করেন, বক ফুলের মালায় তাঁর বেণী জড়ালে ক্ষতি হত না, কিন্তু সে কথাটা মনেও আমল পায় না। কুন্দ আছে, টগর আছে, তাদেরও গন্ধ নেই, তবু অলংকার-মহলে তাদের দ্বার খোলা – কেননা, পেটের ক্ষুধা তাদের গায়ে হাত দেয় নি। বিম্ব যদি ঝোলে-ডালনায় লাগত তা হলে সুন্দরীর অধরের সঙ্গে তার উপমা অগ্রাহ্য হত। তিসি ফুল সর্ষে ফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি বলেই কবিকল্পনা তাদের নম্র নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না। শিরীষ ফুলের সঙ্গে গোলাপজাম ফুলের রূপে গুণে ভেদ নেই, তবু কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে ওর কৌলীন্য গেল; কেননা গোলাপজাম নামটা ভোজনলোভের দ্বারা লাঞ্ছিত। যে-কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাতবিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল। কাব্যে সৌভাগ্যক্রমে কোনো শুভক্ষণে রসজ্ঞ দেবতাদের বিচারে মদনের তুণে আমের মুকুল স্থান পেয়েছে। বোধ করি, অমৃতে অনটন ঘটে না বলেই আমের প্রতি দেবতাদের আহারে লোভ নেই। স্বচ্ছ জলের তলে রুইমাছের সন্তরণলীলা আকাশে পাখি ওড়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়; কিন্তু, রুইমাছের নাম করবামাত্র পাঠকের রসবোধ পাছে নিঃশেষে রসনার

দিকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এই ভয়ে ছন্দোবন্ধনে বেঁধে ওকে কাব্যের তীরে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হল। সকল ব্যবহারের অতীত বলেই মকর বেঁচে গেছে – ওকে বাহনভুক্ত ক'রে নিতে দেবী জাহ্নবীর গৌরবহানি হল না, নির্বাচনের সময় রুই কাতলাটার নাম মুখে বেধে গেল। তার পিঠে স্থানাভাব বা পাখনায় জোর কম বলেই এমনটা ঘটেছে তা তো মানতে পারি নে। কেননা, লক্ষ্মী সরস্বতী যখন পদ্মকে আসন বলে বেছে নিলেন তার দৌর্বল্য বা অপ্রশস্ততার কথা চিন্তাও করেন নি।

এইখানে চিত্রকলার সুবিধা আছে। কচু গাছ আঁকতে রূপকারের তুলিতে সংকোচ নেই। কিন্তু, বনশোভাসজ্জায় কাব্যে কচুগাছের নাম করা মুশকিল। আমি নিজে জাত-মানা কবির দলে নই, তবু বাঁশবনের কথা পাড়তে গেলে অনেক সময় বেণুবন ব'লে সামলে নিতে হয়। শব্দের সঙ্গে নিত্যব্যবহারগত নানা ভাব জড়িয়ে থাকে। তাই কাব্যে কুর্‌চি ফুলের নাম করবার বেলা কিছু ইতস্তত করেছি, কিন্তু কুর্‌চি ফুল আঁকতে চিত্রকরের তুলির মানহানি হয় না।

এইখানে এ কথাটা বলা দরকার, য়ুরোপীয় কবিদের মনে শব্দ সম্বন্ধে শুচিতার সংস্কার এত প্রবল নয়। নামের চেয়ে বস্তুটা তাঁদের কাছে অনেক বেশি, তাই কাব্যে নাম-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের লেখনীতে আমাদের চেয়ে বাধা কম।

যা হোক এটা দেখা গেছে যে, যে-জিনিসটাকে কাজে খাটাই তাকে যথার্থ ক'রে দেখি নে। প্রয়োজনের ছায়াতে সে রাহুগ্রস্ত হয়। রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজন, কিন্তু বিশ্বজনের কাছে গৃহস্থ ঐ দুটো ঘর গোপন ক'রে রাখে। বৈঠকখানা না হলেও চলে, তবু সেই ঘরেই যত সাজসজ্জা, যত মালমসলা; গৃহকর্তা সেই ঘরে ছবি টাঙিয়ে, কার্পেট পেতে, তার উপর নিজের সাধ্যমত সর্বকালের ছাপ মেরে দিতে চায়। সেই ঘরটিকে সে বিশেষভাবে বাছাই করেছে; তার দ্বারাই সে সকলের কাছে পরিচিত হতে চায় আপন ব্যক্তিগত মহিমায়। সে যে খায় বা খাদ্যসঞ্চয় করে, এটাতে তার ব্যক্তিস্বরূপের সার্থকতা

নেই। তার একটি বিশিষ্টতার গৌরব আছে, এই কথাটি বৈঠকখানা দিয়েই জানাতে পারে। তাই বৈঠকখানা অলংকৃত।

জীবধর্মে মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ নেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রবল। এই প্রবৃত্তিতে মনুষ্যত্বের সার্থকতা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই ভোজনের ইচ্ছা ও সুখ যতই প্রবল হোক ব্যাপক হোক, সাহিত্যে ও অন্য কলায় ব্যঙ্গের ভাবে ছাড়া শ্রদ্ধার ভাবে তাকে স্বীকার করা হয় নি। মানুষের আহারের ইচ্ছা প্রবল সত্য, কিন্তু সার্থক সত্য নয়। পেট-ভরানো ব্যাপারটা মানুষ তার কলালোকের অমরাবতীতে স্থান দেয় নি।

স্ত্রীপুরুষের মিলন আহার ব্যাপারের উপরের কোঠায়; কেননা, ওর সঙ্গে মনের মিলনের নিবিড় যোগ। জীবধর্মের মূল প্রয়োজনের দিক থেকে এটা গৌণ, কিন্তু মানুষের জীবনে তা মুখ্যকে বহু দূরে ছাড়িয়ে গেছে। প্রেমের মিলন আমাদের অন্তর-বাহিরকে নিবিড় চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। বংশরক্ষায় মুখ্য তত্ত্বটুকুতে সেই দীপ্তি নেই। তাই শরীরবিজ্ঞানের কোঠাতেই তার প্রধান স্থান। স্ত্রীপুরুষের মনের মিলনকে প্রকৃতির আদিম প্রয়োজন থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তাকে তার নিজের বিশিষ্টতাতেই দেখতে পাই। তাই কাব্যে ও সকলপ্রকার কলায় সে এতটা জায়গা জুড়ে বসেছে।

যৌনমিলনের যে চরম সার্থকতা মানুষের কাছে তা "প্রজনার্থং' নয়, কেননা সেখানে সে পশু; সার্থকতা তার প্রেমে, এইখানে সে মানুষ। তবু যৌনমিলনের জীবধর্ম ও মানুষের চিত্তধর্ম উভয়ের সীমানা-বিভাগ নিয়ে সহজেই গোলমাল বাধে। সাহিত্যে আপন পুরো খাজনা আদায়ের দাবী ক'রে পশুর হাত মানুষের হাত উভয়েই একসঙ্গে অগ্রসর হয়ে আসে। আধুনিক সাহিত্যে এই নিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারি মামলা চলছেই।

উপরে যে পশু-শব্দটা ব্যবহার করেছি ওটা নৈতিক ভালোমন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে। বংশরক্ষাঘটিত পশুধর্ম

মানুষের মনস্তত্ত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন। কিন্তু, সে হল বিজ্ঞানের কথা; মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মূল্য আছে। কিন্তু, রসবোধ নিয়ে যে সাহিত্য ও কলা সেখানে এর সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। অশোকবনে সীতার দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া হওয়া উচিত ছিল, এ কথাও বিজ্ঞানের; সংসারে এ কথার জোর আছে, কিন্তু কাব্যে নেই। সমাজের অনুশাসন সম্বন্ধেও সেই কথা। সাহিত্যে যৌনমিলন নিয়ে যে তর্ক উঠেছে সামাজিক হিতবুদ্ধির দিক থেকে তার সমাধান হবে না, তার সমাধান কলারসের দিক থেকে। অর্থাৎ, যৌনমিলনের মধ্যে যে দুটি মহল আছে মানুষ তার কোন্‌টিকে অলংকৃত ক'রে নিত্যকালের গৌরব দিতে চায়, সেইটিই হল বিচার্য।

মাঝে মাঝে এক-একটা যুগে বাহ্য কারণে বিশেষ কোনো উত্তেজনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সাহিত্যের ক্ষেত্র অধিকার ক'রে তার প্রকৃতিকে অভিভূত করে দেয়। য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় সেই যুদ্ধের চঞ্চলতা কাব্যে আন্দোলিত হয়েছিল। সেই সাময়িক আন্দোলনের অনেকটাই সাহিত্যের নিত্যবিষয় হতেই পারে না; দেখতে দেখতে তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে পিউরিটান যুগের পরে যখন চরিত্রশৈথিল্যের সময় এল তখন সেখানকার সাহিত্যসূর্য তারই কলঙ্কলেখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। কিন্তু, সাহিত্যের সৌরকলঙ্ক নিত্যকালের নয়। যথেষ্ট পরিমাণে সেই কলঙ্ক থাকলেও প্রতি মুহূর্তে সূর্যের জ্যোতিস্বরূপ তার প্রতিবাদ করে, সূর্যের সত্তায় তার অবস্থিতি সত্ত্বেও তার সার্থকতা নেই। সার্থকতা হচ্ছে আলোতে।

মধ্যযুগে একসময় য়ুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে, এ কথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল; ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য, তার সিংহাসন ধর্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানব মনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তক্‌মা প'রে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত; তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাতধর্ম; সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বরা। বিজ্ঞানের নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ ক'রে নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত। আজকালকার য়ুরোপীয় সাহিত্যে যৌনমিলনের দৈহিকতা নিয়ে খুব একটা উপদ্রব চলছে সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেস্‌টোরেশন-যুগে সেটা ছিল লালসা। কিন্তু, সেই যুগের লালসার উত্তেজনাও যেমন সাহিত্যের রাজটিকা চিরদিনের মত পায় নি, আজকালকার দিনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ঔৎসুক্যও সাহিত্যে চিরকাল টিঁকতে পারে না।

একদিন আমাদের দেশে নাগরিকতা যখন খুব তপ্ত ছিল তখন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের যথেষ্ট আদর দেখেছি। মদনমোহন তর্কালংকারের মধ্যেও সে ঝাঁজ ছিল। তখনকার দিনের নাগরিক-সাহিত্যে এ জিনিসটার ছড়াছড়ি দেখা গেছে। যারা এই নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল তারা মনে করতে পারত না যে, সেদিনকার সাহিত্যের রসাকাঠের এই ধোঁয়াটাই প্রধান ও স্থায়ী জিনিস নয়, তার আগুনের শিখাটাই আসল। কিন্তু আজ দেখা গেল, সেদিনকার সাহিত্যের গায়ে যে কাদার ছাপ পড়েছিল সেটা তার চামড়ার রঙ নয়, কালস্রোতের ধারায় আজ তার চিহ্ন নেই। মনে তো আছে, যেদিন ঈশ্বরগুপ্ত পাঁঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজরাজের এই হঠাৎ-শহর কলকাতার বাবুমহলে কিরকম তার প্রশংসাধ্বনি উঠেছে। আজকের দিনের পাঠক তাকে কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না; পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার ক'রে নয় ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই ব'লেই।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্যপদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য;

যে-আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলো-মাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক ক'রে তুলে তাই চিৎকারশব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত-উৎসব ব'লে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলি নে। অতএব সাইকো-অ্যানালিসিসে এর কার্যকারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু, মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিত করাকেই আনন্দপ্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এ ক্ষেত্রে অসংগত ব'লেই আপত্তি করব, অসত্য ব'লে নয়।

সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা-মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি। এ প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসবের দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাতলামির ভূতে-পাওয়া মাদল-করতালের খচোখচোখচকার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুনঃ আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে, তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কি না। যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে এটা সংগীত কি না। মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে একরকম উল্লাস হয়; কণ্ঠের অক্লান্ত উত্তেজনায় খুব-একটা জোরও আছে। মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ বলে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু, ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়।

উপসংহারে এ কথাও বলা দরকার যে, সম্প্রতি যে দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতুহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি

করছে, সে-দেশের সাহিত্য অনন্ত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্মের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু, যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি সে-দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে। ভারতসাগরের ওপারে যদি প্রশ্ন করা যায় “তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন’, উত্তর পাই, “হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেছে!’ ভারতসাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, “হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরি।’

১৩৩৪

সাহিত্যে নবত্ব

সকল দেশের সাহিত্যেরই প্রধান কাজ হচ্ছে শোনবার লোকের আসনটি বড়ো ক’রে তোলা, যেখান থেকে দাবি আসে। নইলে লেখবার লোকের শক্তি খাটো হয়ে যায়। যে-সব সাহিত্য বনেদি তারা বহু কালের আর বহু মানুষের কানে কথা কয়েছে। তাদের কথা দিন-আনি-দিন-খাই তহবিলের ওজনে নয়। বনেদি সাহিত্যে সেই শোনবার কান তৈরি ক’রে তোলে। যে-সমাজে অনেক পাঠকের সেই শোনবার কান তৈরি হয়েছে সে-সমাজে বড়ো ক’রে লেখবার শক্তি অনেক লেখকের মধ্যে আপনিই দেখা দেয়, কেবলমাত্র খুচরো মালের ব্যবসা সেখানে চলে না। সেখানকার বড়ো মহাজনদের কারবার আধা নিয়ে নয়, পুরো নিয়ে। তাদের আধা’র ব্যাপারী বলব না, সুতরাং জাহাজের খবর তাদের মেলে।

বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজি শিক্ষার যোগে এমন সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের চেনাশোনা হল যার স্থান বিপুল দেশের ও নিরবধি কালের। সে সাহিত্যের বলবার বিষয়টা যতই বিদেশী হোক-না, তার বলবার আদর্শটা সর্বকালীন ও সর্বজনীন। হোমরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্যরচনার যে-আদর্শটা আছে যেহেতু তা সার্বভৌমিক এইজন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীক কাব্য প’ড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী, কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার ক’রে নিতে বাধা পায় না। শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্প বলাটা একান্ত বাঙালির নয়; সেইজন্যে তাঁর গল্প-সাহিত্যের জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জাত-বিচারের কথা উঠতেই পারে না। গল্প-বলার সর্বজনীন আদর্শটাই ফলাও ক্ষেত্রে সকল লোককে ডাক দিয়ে আনে। সেই আদর্শটা খাটো হলেই নিমন্ত্রণটা ছোটো হয়; সেটা পারিবারিক ভোজ হতে পারে, স্বজাতের ভোজ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের যে-তীর্থে সকল দেশের যাত্রী এসে মেলে সে-তীর্থের মহাভোজ হবে না।

কিন্তু, মানুষের কানের কাছে সর্বদাই যারা ভিড় ক'রে থাকে, যাদের ফরমাশ সব চেয়ে চড়া গলায়, তাদের পাতে যোগান দেবার ভার নিতে গেলেই ঠকতে হবে; তারা গাল পাড়তে থাকলেও তাদের এড়িয়ে যবোর মতো মনের জোড় থাকা চাই। যাদের চিত্ত অত্যন্ত ক্ষণকালবিহারী, যাদের উপস্থিত গরজের দাবী অত্যন্ত উগ্র, তাদেরই হট্টগোল সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। সকালবেলার সূর্যালোকের চেয়ে বেশি দৃষ্টিতে পড়ে যে-আলোটা ল্যাম্প-পোষ্টের উপরকার কাচফলক থেকে ঠিকরে চোখে এসে বেঁধে। আবদারের প্রাবল্যকেই প্রামাণ্য মনে করার বিপদ আছে।

যে-লেখকের অন্তরেই বিশ্বশ্রোতার আসন তিনিই বাইরের শ্রোতার কাছ থেকে নগদ বিদায়ের লোভ সামলাতে পারেন। ভিতরের মহানীরব যদি তাঁতে বরণমালা দেয় তা হলে তাঁর আর ভাবনা থাকে না, তা হলে বাইরের নিত্যমুখরকে তিনি দূর থেকে নমস্কার ক'রে নিরাপদে চলে যেতে পারেন।

ইংরেজি শিক্ষার গোড়াতেই আমরা যে-সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে বিশ্ব-সাহিত্যের আদর্শ ছিল এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু, তাই ব'লে এ কথা বলতে পারব না যে, এই আদর্শ য়ুরোপে সকল সময়েই সমান উজ্জ্বল থাকে। সেখানেও কখনো কখনো গরজের ফরমাশ যখন অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে তখন সাহিত্যে খর্বতার দিন আসে। তখন ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক, বায়োলজির লেকচারার, সোসিওলজির গোল্ড মেডালিস্ট সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় ক'রে ধরণা দিয়ে বসেন।

সকল দেশের সাহিত্যেই দিন একটানা চলে না; মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেলেই বেলা পড়ে আসতে থাকে। আলো যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখনি অদ্ভুতের প্রাদুর্ভাব হয়। অন্ধকারের কালটা হচ্ছে বিকৃতির কাল। তখন অলিতে-গলিতে আমরা কন্ধকাটাকে দেখতে পাই, আর তার কুৎসিত কল্পনাটাকেই একান্ত ক'রে তুলি।

বস্তুত সাহিত্যের সায়াহ্নে কল্পনা ক্লান্ত হয়ে আসে ব’লেই তাকে বিকৃতিতে পেয়ে বসে; কেননা, যা-কিছু সহজ তাতে তার আর শানায় না। যে-অক্লিষ্ট শক্তি থাকলে আনন্দসম্ভোগ স্বভাবতই সম্ভবপর সেই শক্তির ক্ষীণতায় উত্তেজনার প্রয়োজন ঘটে। তখন মাতলামিকেই পৌরুষ বলে মনে হয়। প্রকৃতিস্থকেই মাতাল অবজ্ঞা করে; তার সংযমকে হয় মনে করে ভান, নয় মনে করে দুর্বলতা।

বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন ক’রে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ’কেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনি সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে, মুখ লাল ক’রে কপালের শিরগুলোকে ফুলিয়ে তুলে ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে, তখনি বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে সাহিতধারায় নৌকো-চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁরে মাতুনি – এতে মাঝিগিরির দরকার নেই – এটা তলিয়ে-যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজ্‌ম্‌। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে এই, আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায় সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি, এ কথা মানতেই হয়। কিন্তু, তা নিয়ে শঙ্কা না ক’রে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে তখনি বুঝি সর্বনাশ হল ব’লে।

য়ুরোপের সাহিত্যে চিত্রকলায় এই-যে বিহ্বলতা ক্ষণে ক্ষণে ও স্থানে স্থানে বীভৎস হয়ে উঠছে এটা হয়তো একদিন কেটে যাবে, যেমন ক’রে বলিষ্ঠ লোক মারাত্মক ব্যামোকেও কাটিয়ে ওঠে। আমার ভয়, দুর্বলকে যখন ছোঁয়াচ লাগবে তখন তার অন্যান্য নানা দুর্গতির মধ্যে এই আর-একটা উপদ্রবের বোঝা হয়তো দুঃসহ হয়ে উঠবে।

ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের শাস্ত্র-মানা ধাত। এইরকম মানুষরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেন, লাল টুপি প'রে বা যে কোনো উগ্রসাজেই হোক তবে আমাদের দেশের ইস্কুল-মাস্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন। শাশুড়ির শাসনে যার চামড়া শক্ত হয়েছে সেই বউ শাশুড়ি হয়ে উঠে নিজের বধূর 'পরে শাসন জারি ক'রে যেমন আনন্দ পান, এঁরাও তেমনি স্বদেশের যে-সব নিরীহ মানুষকে নিজেদের স্কুলবয় ব'লে ভাবতে চিরদিন অভ্যস্ত তাদের উপর উপরওয়ালা রাশিয়ান হেডমাস্টারদের কড়া বিধান জারি ক'রে পদোন্নতির গৌরব কামনা করেন। সেই হেডমাস্টারের গদ্‌গদ ভাষার অর্থ কী ও তার কারণ কী, সে কথা বিচার করবার অভ্যাস নেই, কেননা সেই হল আধুনিক কালের আপ্তবাক্য।

আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয় পাকা হবার মতো যথেষ্ট সময় পাই নি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে। মঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বার বার তাঁদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যাবসায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। যথার্থ যে বীর সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জা বোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরি নেই। অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; বোঝা যায় যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে। এই নব অভ্যুদয়ের অভিনন্দন করতে আমি কুণ্ঠিত হই নে।

কিন্তু, শক্তির একটা নূতন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল ক'রে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেইখানেই উদ্দাম ভঙ্গিতে কেবল জলের নীচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ। বাঁধি গতের সাহায্য ছাড়া তার চলবার শক্তি নেই ব'লেই সে হাল-আমলের নূতনত্বেরও কতকগুলো বাঁধি বুলি সংগ্রহ ক'রে রাখে। বিলিতি পাকশালায়

ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি পাউডর বাঁধা নিয়মে তৈরি ক'রে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে; লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে-সাজানো বাঁধি বুলি আছে – অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে "রিয়ালিটির কারি-পাউডর'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।

অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্রবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে; যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। "আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার ক'রে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ' এই আস্ফালন করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের মতো হয়ে উঠছে। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় "দরিদ্র-নারায়ণের' ভোগের ব্যবস্থা কিছুই রাখেন নি; ভালোরকম উপার্জনও করেন, সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকেন; দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডরের যোগে একটা কৃত্রিম সস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।

সাহিত্যে লালসা ইতিপূর্বে স্থান পায় নি বা এর পরে স্থান পাবে না, এমন কথা সত্যের খাতিরে বলতে পারি নে, কিন্তু, ও জিনিসটা সাহিত্যের পক্ষে বিপদ্‌জনক। বলা বাহুল্য, সামাজিক বিপদের কথাটা আমি তুলছি নে। বিপদের কারণটা হচ্ছে, ওটা অত্যন্ত সস্তা, ধুলোর উপরে শুয়ে পড়ার মতোই সহজসাধ্য। অর্থাৎ, ধুলোয় যার লুটোতে সংকোচ নেই তার পক্ষে একেবারেই সহজ। পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনা সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়। এইজন্যেই, পাঠকসমাজে এমন একটা কথা যদি ওঠে যে, সাহিত্যে লালসাকে একান্ত উন্মথিত করাটাই আধুনিক যুগের একটা মস্ত ওস্তাদি, তা হলে এজন্যে বিশেষ শক্তিমান লেখকের দরকার হবে না – সাহস দেখিয়ে বাহাদুরি করবার

নেশা যাদের লাগবে তারা এতে অতি সহজেই মেতে উঠতে পারবে। সাহসটা সমাজেই কী, সাহিত্যেই কী, ভালো জিনিস। কিন্তু, সাহসের মধ্যেও শ্রেণীবিচার, মূল্যবিচার আছে। কোন-কিছুকে কেয়ার করি নে ব'লেই যে সাহস, তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে একটা-কিছুকে কেয়ার করি ব'লেই যে সাহস। মানুষের শরীর-ঘেঁষা যে-সব সংস্কার জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরোনো, প্রথম অধ্যায় থেকেই তাদের আরম্ভ। একটু ছুঁতে-না-ছুঁতেই তারা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে ওঠে। মেঘনাদবধের নরকবর্ণনায় বীভৎস রসের অবতারণা উপলক্ষে মাইকেল এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন ক'রে উদ্‌গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে – এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিত্বশক্তির প্রয়োজন করে না, কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে-সব ঘৃণ্যতার মূল তার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে জায়গা পাবে না, এ কথা বলব না কিন্তু সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক সস্তা জিনিস হয় তা হলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।

তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের, কাঁকর ও পদ্মের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই, অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে, এমন একটা প্রশ্ন পরম্পরায় কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে। যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই; তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। কিন্তু, কিছুর সঙ্গে কিছুরই মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তা হলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো সমান দামের হয়ে ওঠে। কেননা, অসীমের মধ্যে নিঃসন্দেহই তাদের সকলেরই এক অবস্থা – খণ্ড দেশকালপাত্রের মধ্যেই তাদের মূল্যভেদ। আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এইজন্যে অতি বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকদেরও যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করি তখন তাঁদের পাতে আমের অকুলোন হলে মাকাল দিতে পারি নে। তত্ত্বজ্ঞানের দোহাই পেড়ে মাকাল যদি দিতে পারতুম এবং দিয়ে যদি বাহবা পাওয়া যেত, তা হলে সস্তায় ব্রাহ্মণভোজন করানো যেত, কিন্তু পুণ্য খতিয়ে দেখবার বেলায় চিত্রগুপ্ত নিশ্চয় পাতঞ্জলদর্শনের মতে হিসাব করতেন না। পুণ্যলাভ করতে শক্তির দরকার। সাহিত্যেও একটা পুণ্যের খাতা খোলা আছে।

ভালোরকম বিদ্যাশিক্ষার জন্যে মানুষকে নিয়ত যে-প্রয়াস করতে হয় সেটাতে মস্তিষ্কের ও চরিত্রের শক্তি চাই। সমাজে এই বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ একটা আদর আছে ব'লেই সাধারণত এত ছাত্র এতটা শক্তি জাগিয়ে রাখে। সেই সমাজই যদি কোনো কারণে কোনো একদিন ব'লে বসে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করাটাই আদরণীয়, তা হলে অধিকাংশ ছাত্র অতি সহজেই সাহস প্রকাশ করবার অহংকার করতে পারে। এই-রকম সস্তা বীরত্ব করবার উপলক্ষ সাধারণ লোককে দিলে তাদের কর্তব্যবুদ্ধিকে দূর্বল করাই হয়। বীর্যসাধ্য সাধনা বহুকাল বহু লোকেই অবলম্বন করেছে ব'লে তাকে সামান্য ও সেকেলে ব'লে উপেক্ষা করবার স্পর্ধা একবার প্রশ্রয় পেলে অতি সহজেই তা সংক্রামিত হতে পারে – বিশেষভাবে, যারা শক্তিহীন তাদেরই মধ্যে। সাহিত্যে এইরকম কৃত্রিম দুঃসাহসের হাওয়া যদি ওঠে তা হলে বিস্তর অপটু লেখকের লেখনী মুখর হয়ে উঠবে, এই আমাদের আশঙ্কা।

আমি দেখেছি কেউ কেউ বলছেন, এই-সব তরুণ লেখকের মধ্যে নৈতিক চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লেই এইরকম সাহিত্যের সৃষ্টি হঠাৎ এমন দ্রুতবেগে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না। এঁরা অনেকেই সাহিত্যে সহজিয়া সাধন গ্রহণ করেছেন, তার প্রধান কারণ এটাই সহজ। অথচ দুঃসাহসিক ব'লে এতে বাহবাও পাওয়া যায়, তরুণের পক্ষে সেটা কম প্রলোভনের কথা নয়। তারা বলতে চায় “আমরা কিছু মানি নে' – এটা তরুণের ধর্ম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না মানতে শক্তির দরকার করে; সেই শক্তির অহংকার তরুণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই অহংকারের আবেগে তারা ভুল করেও থাকে; সেই ভুলের বিপদ সত্ত্বেও তরুণের এই স্পর্ধাকে আমি শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু, যেখানে না মানাই হচ্ছে সহজ পন্থা, সেখানে সেই অশক্তের সস্তা অহংকার তরুণের পক্ষেই সব চেয়ে অযোগ্য। ভাষাকে মানি নে যদি বলতে পারি তা হলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে তা হলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিতমত কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।

প্লান্‌সিউজ জাহাজ, ২৩ অগষ্ট ১৯২৭

সাহিত্যবিচার

সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত; শ্রেণীগত নয়। এখানে “ব্যক্তি’ শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই; স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠছে, তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।

ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউ-বা সুস্পষ্ট কেউ-বা অস্পষ্ট। অন্তত, যে-মানুষ উপলব্ধি করে তার পক্ষে। সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়; বিশ্বের যে -কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি; জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, পর্বত, সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, বস্তুর জিনিস, ভাবের জিনিস, সমস্তই ব্যক্তি – নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হল তা হলে সাহিত্যে সে লজ্জিত।

যে গুণে এরা সাহিত্যে সেই পরিমাণে ব্যক্ত হয়ে ওঠে, যাতে আমাদের চিত্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই গুণটি দুর্লভ – সেই গুণটিই সাহিত্যরচয়িতার। তা রজোগুণও নয়, তমোগুণও নয়, তা কল্পনাশক্তির ও রচনাশক্তির গুণ।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষকে, অসংখ্য জিনিসকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই নে। প্রয়োজন হিসাবে বা সাংসারিক প্রভাব হিসাবে তারা পুলিস ইন্‌স্পেক্টর বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অত্যন্ত পরিদৃষ্ট এবং পরিপুষ্ট হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তারা হাজার হাজার পুলিস ইন্‌স্পেক্টর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই অকিঞ্চিৎকর, এমন-কি, যাদের প্রতি তারা কর্তৃত্ব করে তাদের অনেকের চেয়ে। সুতরাং তারা অচিরকালীন বর্তমান অবস্থার বাইরে মানুষের অন্তরঙ্গরূপে প্রকাশমান নয়।

কিন্তু, সাহিত্যরচয়িতা আপন সৃষ্টিশক্তির গুণে তাদেরও চিরকালীন রূপে ব্যক্ত করে দাঁড় করাতে পারে। তখন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দণ্ডবিধাতারূপে কোনো শ্রেণী বা পদের

প্রতিনিধিরূপে নয়, কেবলমাত্র আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যে মূল্যবান। ধনী বলে নয়, মানী বলে নয়, জ্ঞানী বলে নয়, সৎ বলে নয়, সত্ত্ব রজ বা তমোগুণান্বিত বলে নয়, তারা স্পষ্ট ব্যক্ত হতে পেরেছে বলেই সমাদৃত। এই ব্যক্ত রূপের সাহিত্যমূল্যটি নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এইজন্যেই সাহিত্যবিচারে অনেকেই ব্যক্তিপরিচয়ের দুরূহ কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে শ্রেণীর পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সহজ পন্থাকে সাধারণত আমাদের দেশের পাঠকেরা অশ্রদ্ধা করেন না; বোধ করি তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশ জাত-মানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়োলোক বলি যার বড়ো পদ, বড়োমানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ, দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পঙ্‌ক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই। এই কারণেই যে সাধু-সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লারশোভিত সরোবর; যূথীজাতিমল্লিকামালতিবিকশিত বসন্তঋতু; তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বলতে পারি নে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য-রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।

সেইজন্যেই দেখি, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়।

সাহিত্যে ভালো-লাগা মন্দ-লাগা হল শেষ কথা। বিজ্ঞানে সত্যমিথ্যার বিচারই শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপিল আছে প্রমাণে। কিন্ত, ভালো মন্দ লাগাটা রুচি নিয়ে; এর উপরে আর-কোনো আপিল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে। এই কারণে জগতে সকলের চেয়ে অরক্ষিত অসহায় জীব হল সাহিত্যরচয়িতা। মৃদুস্বভাব হরিণ পালিয়ে বাঁচে, কিন্তু কবি ধরা পড়ে

ছাপার অক্ষরের কালো জালটায়। এ নিয়ে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই; নিজের অনিবার্য কর্মফলের উপরে জোর খাটে না।

রুচির মার যখন খাই তখন চুপ ক'রে সহ্য করাই ভালো, কেননা সাহিত্যরচয়িতার ভাগ্যচক্রের মধ্যেই রুচির কুগ্রহ-সুগ্রহের চিরনির্দিষ্ট স্থান। কিন্তু, বাইরে থেকে যখন আসে উল্কাবৃষ্টি, সম্মার্জনী হাতে আসে ধূমকেতু, আসে উপগ্রহের উপসর্গ, তখন মাথা চাপড়ে বলি, এ যে মারের উপরি-পাওনা। বাংলাসাহিত্যের অন্তঃপুরে শ্রেণীর যাচনদার বাহির হতে ঢুকে পড়েছে; কেউ তাদের দ্বাররোধ করবার নেই। বাউলকবি দুঃখ ক'রে বলেছে, ফুলের বনে জহুরী ঢুকেছে, সে পদ্মফুলকে নিকষে ঘষে ঘষে বেড়ায়, ফুলকে দেয় লজ্জা।

আমরা সহজেই ভুলি যে, জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতিবিচার নেই, সেখানে আর-সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে। অমুক কুলীন ব্রাহ্মণ, এই পরিচয়েই অতি অযোগ্য মানুষও ঘরে ঘরে বরমাল্য লুটে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তি হিসাবে তার যোগ্যতা সপ্রমাণ হয় না। লোকটা কুলীন কি না কুলপঞ্জিকা দেখলেই সকলেই সেটা বলতে পারে, অথচ ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ণয় করতে যে সমজদারের প্রয়োজন তাকে খুঁজে মেলা ভার। এইজন্যে সমাজে সাধারণত শ্রেণীর কাঠামোতেই মানুষকে বিভক্ত করে; জাতিকূলের মর্যাদা দেওয়া, ধনের মর্যাদা দেওয়া সহজ। সেই বিচারেই ব্যক্তির প্রতি সর্বদাই সমাজে অবিচার ঘটে, শ্রেণীর বেড়ার বাইরে যোগ্যব্যক্তির স্থান অযোগ্যব্যক্তির পঙ্‌ক্তির নীচে পড়ে। কিন্তু, সাহিত্যে জগন্নাথের ক্ষেত্র; এখানে জাতির খাতিরে ব্যক্তির অপমান চলবে না। এমন-কি, এখানে বর্ণসংকর দোষও দোষ নয়; মহাভারতের মতোই উদারতা। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম-ইতিহাস নিয়ে এখানে কেউ তাঁর সম্মান অপহরণ করে না; তিনি তাঁর নিজের মহিমাতেই মহীয়ান। অথচ আমাদের দেশে দেবমন্দিরপ্রবেশেও যেমন জাতিবিচারকে কেউ নাস্তিকতা মনে করে না, তেমনি সাহিত্যের সরস্বতীর মন্দিরের পাণ্ডারা দ্বারের কাছে কুলের বিচার করতে সংকোচ করে না। হয়তো ব'লে বসে, এ লেখাটার চাল কিম্বা স্বভাব বিশুদ্ধ ভারতীয় নয়, এর কুলে যবনস্পর্শ দোষ আছে। দেবী ভারতী স্বয়ং এরকমের মেল-বন্ধন মানেন না, কিন্তু পাণ্ডারা

এই নিয়ে তুমুল তর্ক তোলে। চৈন চিত্র-বিশ্লেষণে প্রমাণ হতে পারে যে, তার কোনো অংশে ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্রব ঘটেছে; কিন্তু সেটা নিছক ইতিহাসের কথা, সারস্বত বিচারের কথা নয়। সে চিত্রের ব্যক্তিত্বটি দেখো, যদি রূপব্যক্ততায় কোনো দোষ না থাকে তাহলে সেখানেই তার ইতিহাসের কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেল। মানুষের মনে মানুষের প্রভাব চারি দিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব না হয় তবে তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয় – তাতে চিত্তের নির্জীবতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু, যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো সূচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভর্ৎসনা না করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার ক'রে আপন সীমানা থেকে বের করে দিয়েছে। সে মরু থাক্ আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে, তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাংলাদেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে, দাশুরায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক।

এটা অন্ধ অভিমানের কথা। এই অভিমানে একদিন শ্রীমতী বলেছিলেন, "কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।' অবস্থাবৈগুণ্যে এরকম মনের ভাব ঘটে সে কথা স্বীকার করা যাক – ওটা হল খণ্ডিতা নারীর মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু, যখন তত্ত্বজ্ঞানী এসে বলেন, সাত্ত্বিকতা হল ভারতীয়ত্ব, রাজসিকতা হল য়ুরোপীয়ত্ব – এই ব'লে সাহিত্যে খানাতল্লাশি করতে থাকেন, লাইন চুনে চুনে রাজসিকতার প্রমাণ বের ক'রে কাব্যের উপরে একঘরে করবার দাগা দিয়ে দেন, কাউকে জাতে রাখেন, কাউকে জাতে ঠেলেন, তখন একেবারে হতাশ হতে হয়।

এক সময়ে ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণপূর্ণ ছিল তখন মধ্য এবং পূর্ব এশিয়া তার নিকট-সংস্পর্শে এসে দেখতে দেখতে প্রভূত শিল্পসম্পদে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হয়েছিল। তাতে এশিয়ায় এনেছিল নবজাগরণ। এজন্য ভারতের বহির্বর্তী এশিয়ার কোনো অংশ কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়। কারণ, যে-কোনো দানের মধ্যে শাশ্বত সত্য আছে তাকে যে-

কোনো লোক যদি যথার্থভাবে আপন ক'রে স্বীকার করতে পারে তবে সে দান সত্যিই তার আপনার হয়। অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণশক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্যলাভ করেছে।

বর্তমান যুগে য়ুরোপে সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারি দিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। সেই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে-কোনো সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু, সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয় – তাকে স্বকীয় ক'রে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প, বেতালপঞ্চবিংশতি হাতেম-তাই গোলেবকাওয়ালী অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে ক'রে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা। বাতাসে সত্যের যে-প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকে আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত; যারা নিষ্প্রতিভ তারাই সেটাকে ঠেকাতে চায়, এবং যেহেতু তারা দলে ভারী এবং তাদের অসাড়তা ঘুচতে অনেক দেরি হয় এই কারণেই প্রতিভার ভাগ্যে দীর্ঘকাল দুঃখভোগ থাকে। তাই বলি, সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।

আরো একটা শ্রেণীবিচারের কথা এই উপলক্ষে আমার মনে পড়ল। মনে পড়বার কারণ এই যে, কিছুদিন পূর্বেই আমার যোগাযোগ উপন্যাসের কুমূর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কোনো লেখিকা আমাকে পত্র লিখেছেন। তাতে বুঝতে পারা গেল, সাহিত্যে নারীকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে দাঁড় করিয়ে দেখবার একটা উত্তেজনা সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন আজকাল তরুণবয়স্কের দল হঠাৎ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম ক'রে দলপতিদের চাটূক্তির চোটে বিনামূল্যে একটা অত্যন্ত উচ্চ এবং বিশেষ শ্রেণীতে

উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, নারীদেরও সেই দশা। সাহিত্যের নারীতে নারীত্ব-নামক একটা শ্রেণীগত সাধারণ গুণ আছে কি না, এই তর্কটা সাহিত্যবিচারে প্রধান্যলাভের চেষ্টা করছে। এরই ফলে কুমূ ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ কুমূ কি না এই সাহিত্যসংগত প্রশ্নটা কারো কারো লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কুমূ মানবসমাজে নারী-নামক জাতির প্রতিনিধির পদ নিতে পারছে কি না – অর্থাৎ তাকে নিয়ে সমস্ত নারীপ্রকৃতির উৎকর্ষ স্থাপন করা হয়েছে কি না। মানবপ্রকৃতির যা-কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তিবিশেষের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ সাহিত্যের। অবশ্য, এ কথা বলাই বাহুল্য, নারীকে আঁকতে গিয়ে তাকে অ-নারী ক'রে আঁকা পাগলামি। বস্তুত, সে কথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমূর যদি কোনো আদর হয় তো সে হবে সে ব্যক্তিগত কুমু ব'লেই, সে নারীশ্রেণীর প্রতিনিধি ব'লে নয়।

কথা উঠেছে, সাহিত্যবিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শ্রদ্ধেয় কি না। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে আলোচ্য এই – কী সংগ্রহ করার জন্যে বিশ্লেষণ। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান-অংশগুলি? আমি বলি সেটা অত্যাবশ্যক নয়; কারণ, উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায়, সেটা হল রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত, অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে সকল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্রদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। আজকাল সাইকো-অ্যানালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে। সৃষ্টিতে অবিশ্লেষ্য সমগ্রতার গৌরব খর্ব করবার মনোভাব জেগে উঠেছে। মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে, কাম ক্রোধ অহংকার ইত্যাদি। ছিন্ন ক'রে দেখলে যে বস্তুপরিচয় পাওয়া যায় সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূরু অস্তিত্ব দ্বারা নয়, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারাই চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ লজ্ঘন করবার উপক্রম করছে। বুদ্ধদেবের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানের মধ্যে কামপ্রবৃত্তিও ছিল, তাঁর যৌবনের ইতিহাস থেকে সেটা প্রমাণ

করা সহজ। যেটা থাকে সেটা যায় না, গেলে তাতে স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ঘটে। চরিত্রের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ ঘটে বর্জনের দ্বারা নয়, যোগের দ্বারা। সেই যোগের দ্বারা যে-পরিচয় সমগ্রভাবে প্রকাশমান সেইটেই হল বুদ্ধদেবের চরিত্রগত সত্য। প্রচ্ছন্নতার মধ্য থেকে বিশেষ উপকরণ টেনে বের করে তাঁর সত্য পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভেদ নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে আছে। সন্দেশে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেলতে হয়; কিন্তু এতে করেই সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর ক'রে বলতে হবে যে, সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেননা, উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী; তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী।

তা হোক, তবু রসভোগকে বিশ্লেষণ করা চলে। মনে করা যাক, আম। যে-ভাবে সেটা ভোগ্য সে-ভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সে অতীত। ভোগ সম্বন্ধে তার রমণীয়তা ব্যাখ্যা করবার উপলক্ষে বলা চলে যে, এই ফলে সব-প্রথমে যেটা মনকে টানে সে হচ্ছে ওর প্রাণের লাবণ্য; এইখানে সন্দেশের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠতা। আমের যে বর্ণমাধুরী তা জীববিধাতার প্রেরণায় আমের অন্তর থেকে উদ্ভাসিত, সমস্ত ফলটির সঙ্গে সে অবিচ্ছেদে এক। চোখ ভোলাবার জন্যে সন্দেশে জাফরান দিয়ে রঙ ফলানো যেতে পারে; কিন্তু সেটা জড়পদার্থের বর্ণযোজন, প্রাণপদার্থের বর্ণ-উদ্ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আমের আছে স্পর্শের সৌকুমার্য, সৌরভের সৌজন্য। তার পরে তার আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটন করলে প্রকাশ পায় তার রসের অকৃপণতা। এইরূপে আম সম্বন্ধে রসভোগের বিশেষত্বটিকে বুঝিয়ে বলাকে বলব আমের রসবিচার। এইখানে স্বাদেশিক এসে পরিচয়পত্রে বলতে পারেন, আম প্রকৃত ভারতবর্ষীয়, সেটা ওর প্রচুর ত্যাগের দাক্ষিণ্যমূলক সাত্ত্বিকতায় প্রমাণ হয়; আর র‍্যাস্‌পবেরি গুস্‌বেরি বিলাতি, কেননা তার রসের ভাগ তার বীজের ভাগের চেয়ে বেশি নয়, পরের তুষ্টির চেয়ে ওরা আপন প্রয়োজনকেই বড়ো করেছে, অতএব ওরা রাজসিক।

এই কথাটা দেশাত্মবোধের অনুকূল কথা হতে পারে; কিন্তু, এইরকমের অমূলক কি সমূলক তত্ত্বালোচনা রসশাস্ত্রে সম্পূর্ণই অসংগত।

সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়ালো এই – সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

১৩৩৬

আধুনিক কাব্য

মডার্‌ন্‌ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্‌নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্‌ন্‌। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক ব'লে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্‌ন্‌স্‌ থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন। যথা ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ কোল্‌রিজ শেলি কীট্‌স্‌।

সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিরে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতা-দুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক-এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে – রচনায় নিখুঁত রীতির ফোঁটাতিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্‌ন্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সে-যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত। "কুমুদকহ্লারসেবিত সরোবর' হচ্ছে সাধু-কারখানায় তৈরি সরকারি ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে, বুলি সরিয়ে, পুরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন

একটা পথ খুলে দেয় যাতে ক'রে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেয়ালে নানাবিধ হয়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে, "ধিক্। '

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া শুরু করলুম তখন সেই আচার-ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জিকেই সাহিত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এডিন্‌বরা রিভিয়ুতে যে-তর্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্মগত সকলপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীট্‌সের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে-অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম করে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই লজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র ক'রে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরুপকরণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর; কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্পকলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে, প্রিয়শিষ্যাললিতে কলাবিধৌ। যে দাম্পত্যসংসার রচনা করত তার রচনাকার্যের জন্য ব্যাঙ্কে-জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিস ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন-তেমন ক'রে মালা গাঁথলে

চলত না; চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা; নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা; তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে-সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখেছিলেন; জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। ওয়ার্ড্‌স্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ড্‌স্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও নিজের হয়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথ্যে। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যদ্বারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায়; সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে-যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান সে-যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে সযত্নে জাগিয়ে রাখতে হয়; সে-যুগে বেশে ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্ছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হল আধুনিকতা।

কিন্তু, আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্যভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম-কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার, ঠোঁটে রঙ লাগানো হয় না তা নয়; কিন্তু সেটা প্রকাশ্য, উদ্ধত অসংকোচে। বলতে চায় মোহ জিনিসটাতে আর-কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ; সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু, বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র

বিচার ক'রে দেখেছে; বলছে, মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিওলজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, এ কথা কবুল করতেই হবে। ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল; লজ্জার যে-আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারি নি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙিন আলো এসেছে সেই আলোতে উষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা সকরুণ। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে; ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সংকোচ লাগে। এই সংকোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই। সৃষ্টিতে যে আবরণ প্রকাশ করে, আচ্ছন্ন করে না, তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্যকে কি নিঃস্ব হতে হয় না।

কিন্তু, আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হূ হূ ক'রে কাজ, হুড়মূড় ক'রে আমোদ-প্রমোদ। যে-মানুষ একদিন রয়ে-বসে আপনার সংসারকে আপনার ক'রে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারি আদর্শে কাজ-চালানো কাণ্ড খাড়া ক'রে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হল কি না সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা-জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, "মারো ঠেলা হেঁইয়োঁ।' জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয়সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই।

কাব্য তা হলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে। নিজের মনের মতো ক'রে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই

করে না, যা-কিছু আছে তাকে আছে ব'লেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনে নয়। আমি কী ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং ঠিকমত কী সেইটেই বিচার্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে-ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখেছেন; I am the greatest laugher of all । বলছেন," আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে।' Than the frog and Apollo এটা হল ভাঙা কাচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে করে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না বলে যদি বলা হত সমুদ্র, তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি করে বলতে পারত, ওটা দস্তুরমত কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উলটো ছাঁদের দস্তুরমত কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।

কিন্তু, কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয়, এ কথা মানবার দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ অ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বৈ ছোটো নয়। আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাই নে। এমন-কি, যথাস্থানে কবিপ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্ হাসিকে এক পঙ্‌ক্তিতেও বসানো যেতে পারে, প্রেয়সী আপত্তি করলেও। কিন্তু, অতিবড়ো বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে-হাসি সূর্যের, যে-হাসি ওক্‌বনস্পতির, যে-হাসি অ্যাপলোর, সে-হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েছে জোর ক'রে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙিন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে; সেই মিঠের আভাসমাত্র নিয়ে ক্ষুধা মেটে না, বস্তু চাই। "ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' বললে প্রায় বারোআনা অত্যুক্তি করা হয়। একটি আধুনিকা মেয়ে কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে-সম্ভাষণ করেছেন সেটাকে তর্জমা ক'রে দিই। তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে, চেষ্টাও সফল হবে না –

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি
যেন পুরনো একটা যাত্রার সুর
বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে-রাখা মাথাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো –
তোমার ওই মিলে-মিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে
আমার মন ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা
তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝক্‌মকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং ক'রে বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেক-কালের যে মাধুরী তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই।

এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা হলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়। তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, "অয়মহং ভোঃ, আমাকে দেখো।' ঐ মেয়ে কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেছেন লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইছে, ভিতরে পালিশ-করা কাচের পিছনে লম্বা সার করে ঝুলছে লাল চটিজুতোর মালা –like stalactites of blood flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas। The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটি-জুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্দার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু, দাঁড়িয়ে দেখতে হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া তারা জিজ্ঞাসা করবে, "মানে কী হল, মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হল্লা কিসের, নাহয় হলই বা তার রঙ লাল।' উত্তরে বলতে হয়, "চেয়েই দেখো-না।' "দেখে লাভ কী' তার কোনো জবাব নাই।

নন্দনতত্ব (Aesthetics) সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে, সে থাকতে পারল না; বলে উঠল, "দেখ্ চেয়ে রে, কী সুন্দর।" এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন

মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেস্‌চিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, "স্থির হয়ে বোস্‌।' তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, "কী সুন্দর।' কবি বলছেন, "শুনে I was mildly abashed।'

সুন্দরী মেয়েকেও দেখো সার্ডিন মাছকেও; একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হোয়ো না, কী সুন্দর। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক – নিছক দেখা; এর পঙ্‌ক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না।

কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা, অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।

সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ, এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে বিবিধপ্রকারে উৎপাত শুরু করে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর-কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় "আমি দ্রষ্টব্য'। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, সে হয়ে উঠেছে ব'লেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নিই, শকুনিকেও মানি, শুয়োরকেও অস্বীকার করতে পারি নে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর; কেউ কাজের, কেউ অকাজের; কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেইরকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর-কোনো জবাবদিহি নেই; যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে, শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা হলে সেটা বর্জনীয়।

এইজন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এইরকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্যতা নয়। এলিয়ট লিখছেন –

এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্‌ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ’টা –
ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, ষে অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুক্‌নো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা সার্শি আর চিম্‌নির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।

তার পরে বাসি বিয়ার-মদের গন্ধ-ওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্ছে –

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,

চিৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

তার পরে পুরুষটার খবর এই –

His soul stretched tight across the skies
That fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o'clock;
And short square fingers stuffing pipes
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জনাওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা, খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগল। বললেন –

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling;
The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলের সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টিকল না। এইখানে কূপমণ্ডূকের মক্‌মক্‌ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বিকার নন। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো

সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেছেন সেটা এত কড়া –

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেক-কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে বলেছেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক'রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব'লে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে ব'লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি না'ও ফোটে, তা হলে ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে – এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষার বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না, কিন্তু অধিকাংশ জগৎসংসার ঐ বৈঠকখানার বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থাটাকে রোমান্টিক বলা যায়। সদ্য-জাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বসৃষ্টিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে, নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে। তার পরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হতে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে, অনাবৃত আকাশে, পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্নরকম ক'রে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে এ'কে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে; কেউ বা এ'কে এমন অশ্রদ্ধা

করে যে, এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে-আকৃতি তারও অন্তরে কেউ বা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে; মনে করে না, গূঢ় ব'লে কিছুই নেই; মনে করে না, যা প্রতীয়মান তাতেই সব-কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ছে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ, এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগপ্রচলিত যত-কিছু আদব ও আব্রু তা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল; দীর্ঘকাল যে-সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস ক'রে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল; মানুষ যে-সকল শোভনরীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা-কিছুকে সে ভদ্র ব'লে জানত তাকে দুর্বল ব'লে, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব'লে, অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল; বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব'লে আজ ধরে নিয়েছে।

কিন্তু, আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল-ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু, এ’কে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক; তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখছেন –

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিই নে। আমার মন নিস্তব্ধ।
যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি –
সে জগৎ কোনো মানুষের না।
পীচগাছে ফুল ধরে, জলের স্রোত যায় বয়ে।

আর একটা ছবি –

নীল জল – নির্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ওই শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল;
তারা বাড়ি ফিরছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।

আর-একটা –

নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
টুপিটা রেখে দিয়েছি ওই পাহাড়ের আগায়,
পাইনগাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার ‘পরে।

একটি বধূর কথা –

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে,
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।
চাঙ্‌কানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট ক'রে,
তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভুর্‌কুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম। ...
আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে –
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল –
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।

চাঙফেঙ্‌শার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তার 'পরে বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখছি নে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব নেই। স্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিসটা আধুনিক হত। কেননা, সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব, আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনি লাগল শুকনো চিংড়িমাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে। এই প্রশ্নের উত্তরে থাকত দেড় লাইন ভরে ফুট্‌কি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, "এটা কী হল।' একেলে কবি উত্তর করত, "এমনতরো হয়েই থাকে।' "অন্যটাও তো হয়।' "হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু দুর্গন্ধ না থাকলে ওর শৌখিন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।' সেকালে কাব্যের বাবুগিরি ছিল, সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা পচা মাংসের বিলাসে।

চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে-বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ববিষয় থেকে ওরা বিশুদ্ধভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে; বলে, আসল, জিনিসটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা, সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই : বুড়ি মারা গেল, সে বড়ো ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা

এসে দস্তুরমত সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এ দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো-খান্‌সামা ডিনার-টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো-ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তা হলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন। একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব, এ খবরটা দেবার মতো বটে। কিন্তু, তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্‌ট্‌ এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে, নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারো এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য, তা হলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে। যদি বলা হয়, আগেকার কবিরা বাছাই ক’রে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকেরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, এঁরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার শখ আছে। অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়। কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না – প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব-সাধনা ব’লে বাহাদুরি করতে হবে।

একজন কবি একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করছেন –

রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।

ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত,
ছিপছিপে যেন রাজপুত্র।
সাদাসিধে চালচলন, সাদাসিধে বেশভূষা –
কিন্তু যখন বলতেন “গুড্ মর্নিং’ আমাদের নাড়ী উঠত চঞ্চল হয়ে।
চলতেন যখন ঝলমল করত।
ধনী ছিলেন অসম্ভব।
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা-কিছু এঁর চোখে পড়ত মনে হত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এ দিকে আমরা যখন মরছি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জ্বলবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটে না,
গাল পাড়ছি মোটা রুটিকে –
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাত্রে
রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে,
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি। ১

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু, এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে, সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব’লে সুন্দর ব’লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব’লে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ব’সে আছে উপবাসী। যাঁরা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেছেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসী উপদেষ্টারা বর্ণনা করেছেন মাটির নীচে গলিত দেহকে কেমন ক’রে পোকায় খাচ্ছে। যে দেহকে সুন্দর ব’লে মনে করি সে যে অস্থিমাংস-রসরক্তের কদর্য সমাবেশ, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চট্‌কা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতিশাস্ত্রে

দেখা গেছে। বৈরাগ্যসাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়, এইরকম প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু, কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে। কিন্তু, এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া – এমন কথা সে খুশি হয়ে বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ ব'লে মনে করি সে ঘুণে ধরা, যাকে সুন্দর ব'লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা?

মন যাদের বুড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অশুচি অসুস্থ হয়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর করতে চায়, গাঁজিয়ে-ওঠা পচা জিনিসের মতো যত- কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ কঁরে তবে তার বলিরেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান ক'রে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত ক'রে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব'লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বলো সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতিভদ্রয়ানার পাণ্ডা ব'লে ব্যঙ্গ কর তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয়, অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বল আর আর্টেই বল, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।

১ মূল কবিতাটি হাতের কাছে না থাকাতে স্মরণ ক'রে তর্জমা করতে হ'ল, কিছু ত্রুটি ঘটতে পারে।

১৩৩৯

সাহিত্যতত্ত্ব

আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল মিলন। আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করি নে। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয় অন্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়।

আমি আছি, এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেইজন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে-কোনো জিনিসের 'পরে আমি উদাসীন থাকতে পারি নে, যাতে আমার ঔৎসুক্য অর্থাৎ যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে, সে যতই তুচ্ছ হোক তাতেই মন হয় খুশি – তা সে হোক-না ঘুড়ি-ওড়ানো, হোক্-না লাটিম-ঘোরানো। কেননা, সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অনুভব করি।

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র ক'রে তুলছে। আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব। নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। একেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে-এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়; উপলব্ধির ঐশ্বর্য সেই তার বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে, "আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

একলা কারাগারের বন্দীর আর-কোনো পীড়ন যদি নাও থাকে তবু আবছায়া হয়ে আসে তার আপনার বোধ, সে যেন নেই-শওয়ার কাছাকাছি আসে। "আমি আছি' এবং

“না-আমি আছে’ এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে; অন্তর-বাহিরের এই সম্মিলনের বাধায় আমার আপন সৃষ্টিকে কৃশ বা বিকৃত ক’রে দিলে নিরানন্দ ঘটায়।

এইখানে তর্ক উঠতে পারে যে, আমির সঙ্গে না-আমির মিলনে দুঃখেরও তো উদ্ভব হয়। তা হতে পারে। কিন্তু, এটা মনে রাখা চাই যে, সুখেরই বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়; বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই অন্তর্ভূত। কথাটা শুনতে স্বতোবিরুদ্ধ কিন্তু সত্য। যা হোক, এ আলোচনাটা আপাতত থাক্, পরে হবে।

আমাদের জানা দুরকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য-কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা। সেইজন্যে উপনিষদ বলেছেন, পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকেই কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়। পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ।

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে-আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। প্রতিদিনের ব্যবহারিক ব্যাপারে ছোটো ছোটে ভাগের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রসারণকে অবরুদ্ধ করে, মনকে বেঁধে রাখে বৈষয়িক সংকীর্ণতায়, প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনাকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়; অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ – সে প্রয়োজনের কাঁচি-ছাঁটা মানুষ।

প্রয়োজনের দাবি প্রবল এবং তা অসংখ্য। কেননা, যতটা আয়োজন আমাদের জরুরি তা আপন পরিমাণ রক্ষা করে না। অভাবমোচন হয়ে গেলেও তৃপ্তিহীন কামনা হাত পেতে থাকে; সঞ্চয়ের ভিড় জমে, সন্ধানের বিশ্রাম থাকে না। সংসারের সকল বিভাগেই এই যে “চাই-চাই’ -এর হাট বসে গেছে, এরই আশেপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে “চাই নে’, অর্থাৎ এমন কিছু চাই নে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত ক’রে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশি। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়; তার যে-রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার-কাঠি-ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত ক’রে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ব’লে জানি নে।

লোকে বলে, সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ। সে কথা বিচার ক’রে দেখবার যোগ্য। সৌন্দর্যরহস্যকে বিশ্লেষণ ক’রে ব্যাখ্যা করবার অসাধ্য চেষ্টা করব না। অনুভূতির বাইরে দেখতে পাই, সৌন্দর্য অনেকগুলি তথ্যমাত্রাকে অর্থাৎ ফ্যাক্‌ট্‌স্‌কে অধিকার করে আছে। সেগুলি সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়, গোলাপের আছে বিশেষ আকার-আয়তনের কতকগুলি পাপড়ি, বোঁটা; তাকে ঘিরে আছে সবুজ পাতা। এই-সমস্তকে নিয়ে বিরাজ করে এই-সমস্তের অতীত একটি ঐক্যতত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উদ্‌বোধিত করে তাকেই যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তিপুরুষ। অসুন্দর সামগ্রীরও প্রকাশ আছে, সেও একটা সমগ্রতা, একটা ঐক্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার বস্তুরূপী তথ্যটাই মুখ্য, ঐক্যটা গৌণ। গোলাপের আকারে আয়তনে, তার সুষমায়, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পর সামঞ্জস্যে, বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিচ্ছে তার সমগ্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এককে; সেইজন্যে গোলাপ আমাদের কাছে কেবল একটি তথ্যমাত্র নয়, সে সুন্দর।

কিন্তু শুধু সুন্দর কেন, যে-কোনো পদার্থই আপন তথ্যমাত্রকে অতিক্রম করে সে আমার কাছে তেমনি সত্য হয় যেমন সত্য আমি নিজে। আমি নিজেও সেই পদার্থ যা বহু তথ্যকে আবৃত ক'রে অখণ্ড এক।

উচ্চ-অঙ্গের গণিতের মধ্যে যে-একটি গভীর সৌষম্য, যে-একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহ গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু জ্ঞানের নয়, তা নিবিড় অনুভূতির; তাতে বিশুদ্ধ আনন্দ। কারণ, জ্ঞানের যে উচ্চ শিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের মুক্তি। এ কেন কাব্যসাহিত্যের বিষয় হয় নি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। হয় নি যে তার কারণ এই যে, এর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ, এ সর্বসাধারণের অগোচর। যে-ভাষার যোগে এর পরিচয় সম্ভব তা পারিভাষিক, বহু লোকের হৃদয়বোধের স্পর্শের দ্বারা সে সজীব উপাদানরূপে গড়ে ওঠে নি। যে-ভাষা হৃদয়ের মধ্যে অব্যবহিত আবেগে প্রবেশ করতে পারে না সে-ভাষায় সাহিত্যরসের সাহিত্যরূপের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে কলকারখানা স্থান নিতে আরম্ভ করেছে। যন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনগত তথ্যকে ছাড়িয়ে তার একটা বিরাট শক্তিরূপ আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পেতে পারে, সে আপন অন্তর্নিহিত সুঘটিত সুসংগতিকে অবলম্বন ক'রে আপন উপাদানকে ছাড়িয়ে আবির্ভূত। কল্পনাদৃষ্টিতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গভীরে যেন তার একটি আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। সেই আত্মস্বরূপ আমাদেরই ব্যক্তিস্বরূপের দোসর। যে-মানুষ তাকে যান্ত্রিক জ্ঞানের দ্বারা নয়, অনুভূতির দ্বারা একান্ত বোধ করে সে তার মধ্যে আপনাকে পায়, কলের জাহাজের কাপ্তেন কলের জাহাজের অন্তরে যেমন পরম অনুরাগে আপন ব্যক্তিপুরুষকে অনুভব করতে পারে। কিন্তু, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন-তত্ত্ব এ জাতের নয়। এ-সব তত্ত্ব জানার দ্বারা নিষ্কাম আনন্দ হয় না তা নয়। কিন্তু, সে আনন্দটি হওয়ার আনন্দ নয়, তা পাওয়ার আনন্দ; অর্থাৎ এই জ্ঞান জ্ঞানীর থেকে পৃথক, এ তার ব্যক্তিগত সত্তার অন্দর-মহলের জিনিস নয়, ভাণ্ডারের জিনিস।

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে বলেছে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সৌন্দর্যের রস আছে; কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্যরসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।

বস্তুর ভিড়ের একান্ত আধিপত্যকে লাঘব করতে লেগেছে মানুষ। সে আপন অনুভূতির জন্যে অবকাশ রচনা করছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ঘড়ায় ক'রে সে জল আনে, এই জল আনায় তার নিত্য প্রয়োজন। অগত্যা বস্তুর দৌরাত্ম তাকে কাঁখে ক'রে মাথায় ক'রে বইতেই হয়। প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে তা হলে ঘড়া হয় আমাদের অনাত্মীয়। মানুষ তাকে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুলল। জল বহনের জন্য সৌন্দর্যের কোনো অর্থই নেই। কিন্তু, এই শিল্পসৌন্দর্য প্রয়োজনের রূঢ়তার চারি দিকে ফাঁকা এনে দিল। যে-ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন ক'রে। মানুষের ইতিহাসে আদিম যুগ থেকেই এই চেষ্টা। প্রয়োজনের জিনিসকে সে অপ্রয়োজনে মূল্য দেয়, শিল্পকলার সাহায্যে বস্তুকে পরিণত করে বস্তুর অতীতে। সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া, তার ধ্যানরূপটাই সত্য, যেখানে মানুষ আপনাতে সমস্ত আত্মসাৎ ক'রে আছে।

কিন্তু, বস্তুকে দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা হেঁট করা কাকে বলে যদি দেখতে চাও তবে ঐ দেখো কেরোসিনের টিনে ঘটস্থাপনা, বাঁকের দুই প্রান্তে টিনের ক্যানেস্ত্রা বেঁধে জল আনা। এতে অভাবের কাছেই মানুষের একান্ত পরাভব। যে-মানুষ সুন্দর ক'রে ঘড়া বানিয়েছে সে-ব্যক্তি তাড়াতাড়ি জলপিপাসাকেই মেনে নেয় নি, সে যথেষ্ট সময় নিয়েছে নিজের ব্যক্তিত্বকে মানতে।

বস্তুর পৃথিবী ধুলোমাটি পাথর লোহায় ঠাসা হয়ে পিণ্ডীকৃত। বায়ুমণ্ডল তার চার দিকে বিরাট অবকাশ বিস্তার করেছে। এরই পরে তার আত্মপ্রকাশের ভূমিকা। এইখান থেকে প্রাণের নিশ্বাস বহমান; সেই প্রাণ অনির্বচনীয়। সেই প্রাণশিল্পকারের তুলি এইখান থেকেই আলো নিয়ে, রঙ নিয়ে, তাপ নিয়ে, চলমান চিত্রে বার বার ভরে দিচ্ছে পৃথিবীর পট। এইখানে পৃথিবীর লীলার দিক, এইখানে তার সৃষ্টি; এইখানে তার সেই ব্যক্তিরূপের প্রকাশ যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না; যার মধ্যে তার বাণী, তার যাথার্থ্য, তার রস, তার শ্যামলতা, তার হিল্লোল। মানুষও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল যেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলায় আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য – যে-সৃষ্টিতে জানা নয়, পাওয়া নয়, কেবল হওয়া। পূর্বেই বলেছি, অনুভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয়বোধের কাজ আছে জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে। আমরা আত্মরক্ষা করি, শত্রু হনন করি, সন্তান পালন করি; আমাদের হৃদয়বৃত্তি সেই-সকল কাজে বেগ সঞ্চার করে, অভিরুচি জাগায়। এই সীমাটুকুর মধ্যে জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ নেই। প্রভেদ ঘটেছে সেইখানেই যেখানে মানুষ আপন হৃদয়ানুভূতিকে কর্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র ক'রে নিয়ে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়, যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য, যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করবার প্রেরণায় ফললাভের অত্যাবশ্যকতাকে সে বিস্মৃত হয়ে যায়। এই মানুষই যুদ্ধ করবার উপলক্ষে কেবল অস্ত্রচালনা করে না, যুদ্ধের বাজনা বাজায়, যুদ্ধের নাচ নাচে। তার হিংস্রতা যখন নিদারুণ ব্যবসায়ে প্রস্তুত তখনো সেই হিংস্রতার অনুভূতিকে ব্যবহারের ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে তাকে অনাবশ্যক রূপ দেয়। হয়তো সেটা তার সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত করতেও পারে। শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয়, বিশ্বসৃষ্টিতে সে আপন অনুভূতির প্রতীক খুঁজে বেড়ায়। তার ভালোবাসা ফেরে ফুলের বনে, তার ভক্তি তীর্থযাত্রা করতে বেরোয় সাগরসংগমে পর্বতশিখরে। সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তত্ত্বে নয়; লীলাময়কে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্যামল যেখানে নবদূর্বাদল। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের

প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন।

যেখানে আমরা এই আপনকে প্রকাশের জন্য উৎসুক, যেখানে আমরা আপনের মধ্যে অপরিমিতকে উপলব্ধি করি সেখানে আমরা অমিতব্যয়ী, কী অর্থে কী সামর্থ্যে। যেখানে অর্থকে চাই অর্জন করতে সেখানে প্রত্যেক সিকি পয়সার হিসাব নিয়ে উদ্‌বিগ্ন থাকি; যেখানে সম্পদকে চাই প্রকাশ করতে সেখানে নিজেকে দেউলে ক'রে দিতেও সংকোচ নেই। কেননা, সেখানে সম্পদের প্রকাশে আপন ব্যক্তিপুরুষেরই প্রকাশ। বস্তুত, "আমি ধনী' এই কথাটি উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করবার মতো ধন পৃথিবীতে কারো নেই। শত্রুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন দেহের প্রত্যেক চাল প্রত্যেক ভঙ্গি সম্বন্ধে নিরতিশয় সাবধান হতে হয়; কিন্তু, যখন নিজের সাহসিকতা প্রকাশই উদ্দেশ্য তখন নিজের প্রাণপাত পর্যন্ত সম্ভব, কেননা এই প্রকাশে ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা খরচা করি বিবেচনাপূর্বক, উৎসবের সময় যখন আপনার আনন্দকে প্রকাশ করি তখন তহবিলের সসীমতা সম্বন্ধে বিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, যখন আমরা আপন ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে প্রবলরূপে সচেতন হই, সাংসারিক তথ্যগুলোকে তখন গণ্যই করি নে। সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু, যাকে ভালোবাসি অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি –

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তথ্যের দিক থেকে এতবড়ো অদ্ভুত অত্যুক্তি আর-কিছু হতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় সংহত হতে পারে চিরকাল। "পাষাণ

মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে’ বস্তুজগতে এ কথাটা অতথ্য, কিন্তু ব্যক্তিজগতে তথ্যের খাতিরে এর চেয়ে কম করে যা বলতে যাই তা সত্যে পৌঁছয় না।

বিশ্বসৃষ্টিতেও তাই। সেখানে বস্তু বা জাগতিক শক্তির তথ্য হিসাবে কড়াক্রান্তির এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু, সৌন্দর্য তথ্যসীমা ছাপিয়ে ওঠে; তার হিসাবের আদর্শ নেই, পরিমাণ নেই।

ঊর্ধ্ব-আকাশের বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ একটা সামান্য তথ্য, কিন্তু উদয়াস্তকালের সূর্যরশ্মির স্পর্শে তার মধ্যে যে অপরূপ বর্ণলীলার বিকাশ হয় সে অসামান্য, সে “ধুমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ’ মাত্র নয়, সে যেন প্রকৃতির একটা অকারণ অত্যুক্তি, একটা পরিমিত বস্তুগত সংবাদ-বিশেষকে সে যেন একটা অপিরিমিত অনির্বচনীয়তায় পরিণত করে দেয়। ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অনুভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।

এইজন্যে সে যখন বলে “চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে’, তখন তাকে পাগলামি ব’লে উড়িয়ে দিতে পারি নে। এইজন্য সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের বেদির উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেননা আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক ক’রে বলা যাক না, শব্দের নির্বাচনে, ভাষার ভঙ্গিতে, ছন্দের ইশারায় এমন-কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে যায়, যেটা অতিশয়। তথ্যের জগতে ব্যক্তিস্বরূপ হচ্ছে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌজন্যের প্রভেদ ঐখানে; কেজো ব্যবহারে হিসেব করা কাজের তাগিদ, সৌজন্যে আছে সেই অতিশয় যা ব্যক্তিপুরুষের মহিমার ভাষা।

প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তাদের বিস্তর ছিল বৈষয়িকতার দায়। প্রয়োজনগুলি ছিল নিরেট নিবিড় গুরুভার; প্রবল

উদ্‌বেগ, প্রবল উদ্যম ছিল তাদের বেষ্টন ক'রে। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই। কেবল এমন-সব সামগ্রী আজও আছে যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না, সৌজন্যের অত্যুক্তি দিয়ে সমস্ত দেশ যাদের অভ্যর্থনা করেছে – যেমন ক'রে আমরা সম্ভ্রমবোধের পরিতৃপ্তি সাধন করি রাজচক্রবর্তীর নামের আদিতে পাঁচটা শ্রী যোগ ক'রে। দেশ তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল অতিশয়ের চূড়ায়, সেই নিম্নভূমির সমতলক্ষেত্রে নয় যেখানে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভিড়। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের যে-পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত সয়, পাথরের রেখায়, শব্দের ভাষায় তারই সম্বর্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।

যা কেবলমাত্র স্থানিক, সাময়িক, বর্তমান কাল তাকে যত প্রচুর মূল্যই দিক, দেশের প্রতিভার কাছ থেকে অতিশয়ের সমাদর সে স্বভাবতই পায় নি, যেমন পেয়েছে জ্যোৎস্নারাতে ভেসে-যাওয়া নৌকোর সেই সারিগান –

মাঝি, তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

যেমন পেয়েছে নাইটিঙ্গেল পাখির সেই গান, যে-গান শুনতে শুনতে কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়াকে –

Listen Eugenia,
How thick the burst comes crowding through the leaves.
Again — thou hearest?
Eternal passion!
Eternal pain!

পূর্বেই বলেছি, রসমাত্রেই অর্থাৎ সকলরকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ। এইখানেই তর্ক উঠতে পারে, যে-জানায় দুঃখ সেই জানাতেও আনন্দ এ কথা স্বতোবিরুদ্ধ। দুঃখকে, ভয়ের বিষয়কে আমরা

পরিহার্য মনে করি তার কারণ, তাতে আমাদের হানি হয়, আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। প্রাণরক্ষার স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল, সেই প্রবৃত্তি ক্ষুন্ন হলে সেটা দুঃসহ হয়। এইজন্যে দুঃখবোধ আমাদের ব্যক্তিগত আত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও সাধারণত তা আমাদের কাছে অপ্রিয়। এটা দেখা গেছে, যে-মানুষের স্বভাবে ক্ষতির ভয়, প্রাণের ভয় যথেষ্ট প্রবল নয় বিপদকে সে ইচ্ছাপূর্বক আহ্বান করে, দুর্গমের পথে যাত্রা করে, দুঃসাধ্যের মধ্যে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। কিসের লোভে। কোনো দুর্লভ ধন অর্জন করবার জন্যে নয়, ভয়-বিপদের সংঘাতে নিজেকেই প্রবল আবেগে উপলব্ধি করবার জন্যে। অনেক শিশুকে নিষ্ঠুর হতে দেখা যায়; কীট পতঙ্গ পশুকে যন্ত্রণা দিতে তারা তীব্র আনন্দ বোধ করে। শ্রেয়োবুদ্ধি প্রবল হলে এই আনন্দ সম্ভব হয় না; তখন শ্রেয়োবুদ্ধি বাধারূপে কাজ করে। স্বভাবত বা অভ্যাসবশত এই বুদ্ধি হ্রাস হলেই দেখা যায়, হিংস্রতার আনন্দ অতিশয় তীব্র, ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে এবং জেলখানার এক শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই দুর্লভ নয়। এই হিংস্রতারই অহৈতুক আনন্দ নিন্দুকদের; নিজের কোনো বিশেষ ক্ষতির উত্তেজনাতেই যে মানুষ নিন্দা করে, তা নয়। যাকে সে জানে না, যে তার কোনো অপকার করে নি, তার নামে অকারণ কলঙ্ক আরোপ করায় যে নিঃস্বার্থ দুঃখজনকতা আছে দলে-বলে নিন্দাসাধনার ভৈরবীচক্রে বসে নিন্দুক ভোগ করে তাই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর এবং কদর্য, কিন্তু তীব্র তার আস্বাদন। যার প্রতি আমরা উদাসীন সে আমাদের সুখ দেয় না, কিন্তু নিন্দার পাত্র আমাদের অনুভূতিকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে রাখে। এই হেতুই পরের দুঃখকে উপভোগ্য সামগ্রী করে নেওয়া মানুষ-বিশেষের কাছে কেন বিলাসের অঙ্গরূপে গণ্য হয়, কেন মহিষের মতো অত বড়ো প্রকাণ্ড প্রবল জন্তুকে বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা উন্মত্ত নৃত্য সম্ভবপর হতে পারে, তার কারণ বোঝা সহজ। দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। ট্রাজেডির মূল্য এই নিয়ে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভালো কিছুই নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি এ ঘটনা তার

সমশ্রেণীর নয়, এ কথা মানতেই হবে। তবুএই ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে চলে আসছে; ভিড় জমছে কত; আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি। বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরতম আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

এত কাল আমি রেখেছিনু তারে যতনভরে
　　শয়ন-'পরে;
ব্যথা পাছে লাগে দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন কুসুমথরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে
　　যতনভরে।
শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলসরসে
　　আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ মরমে পশে
　　আবেশবশে।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
প্রাণেতে আমাতে খেলব দুজনে ঝুলন-খেলা
নিশীথ বেলা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন –

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।

বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাঁকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোন্যালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকেও। তখন কী হয়। মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।

এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতায় সংসারে এমন-কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না, যেখানে আমাদের ব্যক্তিবোধকে জাগ্রত রাখবার মতো এমন কোনো বাণী নেই যা স্পষ্ট ভাষায় বলছে “আমি আছি’। বিরহের শূন্যতায় যখন শকুন্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন তাঁর দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি, “অয়মহং ভোঃ।’ এই-যে আমি আছি। সে বাণী পৌঁছল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অন্তরাত্মা জবাব দিল না, “এই যে আমিও আছি।’ দুঃখের কারণ ঘটল সেইখানে। সংসারে “আমি আছি’

এই বাণী যদি স্পষ্ট থাকে তা হলেই আমার আপনার মধ্য থেকে তার নিশ্চিত উত্তর মেলে, “আমি আছি।’ “আমি আছি’ এই বাণী প্রবল সুরে ধ্বনিত হয় কিসে। এমন সত্যে যাতে রস আছে পূর্ণ। আপন অন্তরে ব্যক্তিপুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি যখন আপন বাইরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ। তাই বাউল গেয়ে বেড়িয়েছে –

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

কেননা, আমার মনের মানুষকেই একান্ত করে পাবার জন্যে পরম মানুষকে চাই, চাই তং বেদ্যং পুরুষং; তা হলে শূন্যতা ব্যথা দেয় না।

আমাদের পেট ভরাবার জন্যে, জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে, আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা ভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে, আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয়ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তার “কৃষ্টি’ র ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায়; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।

ক্লাসঘরের দেয়ালে মাধব আর-এক ছেলের নামে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রেখেছে “রাখালটা বাঁদর’। খুবই রাগ হয়েছে। এই রাগের বিষয়ের তুলনায় অন্য-সকল ছেলেই তার কাছে অপেক্ষাকৃত অগোচর। অস্তিত্ব হিসাবে রাখাল যে কত বড়ো হয়েছে তা অক্ষরের ছাঁদ দেখলেই বোঝা যাবে। মাধব আপন স্বল্প শক্তি-অনুসারে আপন রাগের অনুভূতিকে আপনার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইটে দিয়ে দেওয়ালের উপর এমন একটা

কালো অক্ষরের রূপ সৃষ্টি করেছে যা খুব বড়ো করে জানাচ্ছে, মাধব রাগ করেছে; যা মাধব চাচ্ছে সমস্ত জগতের কাছে গোচর করতে। ঐটেকে একটা গীতি-কবিতার বামন অবতার বলা যেতে পারে। মাধবের অন্তরে যে অপরিণত পঙ্গু কবি আছে, রাখালের সঙ্গে বানরের উপমার বেশি তার কলমে আর এগোল না। বেদব্যাস ঐ কথাটাই লিখেছিলেন মহাভারতের পাতায় শকুনির নামে। তার ভাষা স্বতন্ত্র, তা ছাড়া তার কয়লার অক্ষর মুছবে না যতই চুনকাম করা যাক। পুরাতত্ত্ববিদ নানা সাক্ষ্যের জোরে প্রমাণ করে দিতে পারেন, শকুনি নামে কোনো ব্যক্তি কোনো কালেই ছিল না। আমাদের বুদ্ধিও সে কথা মানবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি সাক্ষ্য দেবে, সে নিশ্চিত আছে। ভাঁড়ুদত্তও বাঁদর বৈকি। কবিকঙ্কণ সেটা কালো অক্ষরে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু, এই বাঁদরগুলোর উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই ভাবটাই উপভোগ্য।

আমাদের দেশে একপ্রকারের সাহিত্যবিচার দেখি যাতে নানা অবান্তর কারণ দেখিয়ে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষগোচরতার মূল্য লাঘব করা হয়। হয়তো কোনো মানবচরিত্রজ্ঞ বলেন, শকুনির মতো অমন অবিমিশ্র দুর্বৃত্ততা স্বাভাবিক নয়, ইয়াগোর অহৈতুক বিদ্বেষবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহদ্‌গুণ থাকা উচিত ছিল; বলেন, যেহেতু কৈকেয়ী বা লেডি ম্যাক্‌বেথ, হিড়িম্বা বা শূর্পণখা, নারী, "মায়ের জাত', এইজন্যে এদের চরিত্রে ঈর্ষা বা কদাশয়তার অত নিবিড় কালিমা আরোপ করা অশ্রদ্ধেয়। সাহিত্যের তরফ থেকে বলবার কথা এই যে, এখানে আর কোনো তর্কই গ্রাহ্য নয়; কেবল এই জবাবটা পেলেই হল, যে-চরিত্রের অবতারণা হয়েছে তা সৃষ্টির কোঠায় উঠেছে, তা প্রত্যক্ষ। কোনো-এক খেয়ালে সৃষ্টিকর্তা জিরাফ জন্তুটাকে রচনা করলেন। তাঁর সমালোচক বলতে পারে, এর গলাটা না গোরুর মতো, না হরিণের মতো, বাঘ ভালুকের মতো তো নয়ই, এর পশ্চাদ্‌ভাগের ঢালু ভঙ্গিটা সাধারণ চতুষ্পদ-সমাজে চলতি নেই, অতএব, ইত্যাদি। সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে একটিমাত্র জবাব এই যে, ঐ জন্তুটা জীবসৃষ্টিপর্যায়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ। ও বলছে "আমি আছি'; "না থাকাই উচিত ছিল' বলাটা টিঁকবে না। যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়ত। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির

এইখানেই মিল; সেই সৃষ্টিতে উট জন্তুটা হয়েছে বলেই হয়েছে, উটপাখিরও হয়ে ওঠা ছাড়া অন্য জবাবদিহি নেই।

মানুষও একেবারে শিশুকাল থেকেই এই আনন্দ পেয়েছে, প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আনন্দ। এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যুক্তিসংগত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট ক'রে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যাবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity ।

ও পারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌॥
এ পারেতে লঙ্কা গাছটা রাঙা টুক্‌টুক্‌ করে - -
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।

এর বিষয়টি অতি সামান্য। কিন্তু, ছন্দের দোল খেয়ে এ যেন একটা স্পর্শযোগ্য পদার্থ হয়ে উঠেছে ব্যাকরণের ভুল থাকা সত্ত্বেও।

ডালিমগাছে পরভু নাচে,
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।

শুনে শিশু খুশি হয়ে ওঠে। এ একটা সুস্পষ্ট চলন্ত জিনিস, যেন একটা ছন্দে-গড়া পতঙ্গ; সে আছে, সে উড়ছে, আর কিছুই নয়, এতেই কৌতুক।

তাই শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে “গল্প বলো'; সেই গল্পকে বলে রূপকথা। রূপকথাই সে বটে; তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যক সংবাদ, সম্ভবপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ত নেই। সে কোনো-একটা রূপ

দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে; সে বাস্তব। গল্প শুরু করা গেল –

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে গিয়ে ঘরে
আয়নাটা পড়েছে নজরে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক'রে রেগে ওঠে ডেকে,
গায়ে দাগ কে দিয়েছে এঁকে।
ঢেঁকিশালে মাসি ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে।
পাকিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, "চাই গ্লিসারিন সোপ!'

ছোটো মেয়ে চোখ দুটো মস্ত ক'রে হাঁ ক'রে শোনে। আমি বলি, "আজ এই পর্যন্ত।' সে অস্থির হয়ে বলে, "না, বলো, তার পরে।' সে নিশ্চিত জানে, সাবানের চেয়ে, যারা সাবান মাখে বাঘের লোভ তাদেরই 'পরে বেশি। তবু এই সম্পূর্ণ আজগবি গল্প তার কাছে সম্পূর্ণ বাস্তব, প্রাণীবৃত্তান্তের বাঘ তার কাছে কিছুই না। ঐ আয়না-দেখা খ্যাপা বাঘকে তার সমস্ত মনপ্রাণ একান্ত অনুভব করাতেই সে খুশি হয়ে উঠছে। এ'কেই বলি মনের লীলা, কিছুই-না নিয়ে তার সৃষ্টি, তার আনন্দ।

সুন্দরকে প্রকাশ করাই রসসাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সে কথা পূর্বেই বলেছি। সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য খুবই সহজ। ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য একতলাওয়ালা, এর মধ্যে সদর-অন্দরের

রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, এই প্রাণের কোঠায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের সংস্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়; তখন সৌন্দর্যের বিচার সহজ হয় না। যেমন মানুষের মুখ! এখানে শুধু চোখে চেয়ে সরাসরি রায় দিতে গেলে ভুল হবার আশঙ্কা। সেখানে সহজ আদর্শে যা অসুন্দর তাকেও মনোহর বলা অসম্ভব নয়। এমন-কি, সাধারণ সৌন্দর্যের চেয়েও তার আনন্দজনকতা হয়তো গভীরতর। ঠুংরির টপ্পা শোনবামাত্র মন চঞ্চল হয়ে থাকে, টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় উদ্‌বুদ্ধ করে। “ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন’ মধুর হতে পারে, কিন্তু “বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী’ মনোহর। একটা কানের, আর-একটা মনের; একটাতে চরিত্র নেই, লালিত্য আছে, আর-একটাতে চরিত্রই প্রধান। তাকে চিনে নেবার জন্যে অনুশীলনের দরকার করে।

যাকে সুন্দর বলি তার কোঠা সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বহুদূরপ্রসারিত। মন ভোলাবার জন্যে তাকে অসামান্য হতে হয় না, সামান্য হয়েও সে বিশিষ্ট। যা আমাদের দেখা অভ্যস্ত ঠিক সেইটেকেই যদি ভাষায় আমাদের কাছে অবিকল হাজির ক’রে দেয়, তবে তাকে বলব সংবাদ। কিন্তু, আমাদের সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার জিনিসকেই সাহিত্য যখন বিশেষ ক’রে আমাদের সামনে উপস্থিত করে তখন সে আসে অভূতপূর্ব হয়ে, সে হয় সেই একমাত্র, আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। সন্তানস্নেহে কর্তব্যবিস্মৃত মানুষ অনেক দেখা যায়, মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র আছেন সেই অতি সাধারণ বিশেষণ নিয়ে। কিন্তু, রাজ্যাধিকারবঞ্চিত এই অন্ধ রাজা কবিলেখনীর নানা সূক্ষ্ম স্পর্শে দেখা দিয়েছেন সম্পূর্ণ একক হয়ে। মোটা গুণটা নিয়ে তাঁর সমজাতীয় লোক অনেক আছে, কিন্তু জগতে ধৃতরাষ্ট্র অদ্বিতীয়; এই মানুষের একান্ততা তাঁর বিশেষ ব্যবহারে নয়, কোনো আংশিক পরিচয়ে নয়, সমগ্রভাবে। কবির সৃষ্টিমন্ত্রে প্রকাশিত এই তাঁর অনন্যসদৃশ স্বকীয় রূপ প্রতিভার কোন্ সহজ নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, ক্ষুদ্র সমালোচকের বিশ্লেষণী লেখনী তার অন্ত পাবে না।

সংসারে অধিকাংশ পদার্থ প্রত্যক্ষত আমাদের কাছে সাধারণশ্রেণীভুক্ত। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলে; তারা যদিচ প্রত্যেকেই বিশেষ লোক তবু আমার কাছে তারা সাধারণ মানুষমাত্র, এক বৃহৎ সাধারণতার আস্তরণে তারা আবৃত, তারা অস্পষ্ট। আমার আপনার কাছে আমি সুনিশ্চিত, আমি বিশেষ; অন্য কেউ যখন তার বিশিষ্টতা নিয়ে আসে তখন তাকে আমারই সমপর্যায়ে ফেলি, আনন্দিত হই।

একটা কথা স্পষ্ট করা দরকার। আমার ধোবা আমার কাছে নিশ্চিত সত্য সন্দেহ নেই, এবং তার অনুবর্তী যে-বাহন সেও। ধোবা ব'লেই প্রয়োজনের যোগে সে আমার খুব কাছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিপুরুষের সম্যক্ অনুভূতির বাইরে।

পূর্বে অন্যত্র এক জায়গায় বলেছি যে, যে-কোনো পদার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধই প্রধান সে-পদার্থ সাধারণশ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, তার বিশিষ্টতা আমাদের কাছে আগোচর হয়ে পড়ে। কবিতায় প্রবেশ করতে সজনে ফুলের বিলম্ব হয়েছে এই কারণেই, তাকে জানি ভোজ্য ব'লে একটা সাধারণ ভাবে। চালতা-ফুল এখনো কাব্যের দ্বারের কাছেও এসে পৌঁছয় নি। জামরুলের ফুল শিরীষ ফুলের চেয়ে অযোগ্য নয়; কিন্তু তার দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন সে আপন চরমরূপে প্রকাশ পায় না, তার পরপর্যায়ের খাদ্য ফলেরই পূর্বপরিচয় রূপে তাকে দেখি। তার নিজেরই বিশিষ্টতার ঘোষণা যদি তার মধ্যে মুখ্য হত তা হলে সে এতদিনে কাব্যে আদর পেত। মুরগি পাখির সৌন্দর্য বঙ্গসাহিত্যে কেন যে অস্বীকৃত, সে কথা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। আমাদের চিত্ত এদেরকে নিজেরই স্বরূপে দেখে না, অন্য-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তার দ্বারা আবৃত ক'রে দেখে।

যাঁরা আমার কবিতা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুনরুক্তি হলেও একটা খবর এখানে বলা চলে। ছিলেম মফস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল, তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ি চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অনুভব করলুম যেদিন

সে হল অনুপস্থিত। সকালে দেখি, স্নানের জল তোলা হয় নি, ঝাড়পোঁছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি। বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, “কোথায় ছিলি।’ সে বললে, “আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে।’ ব’লেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক্ ক’রে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ ব’লে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল; সে হল প্রত্যক্ষ, সে হল বিশেষ।

সুন্দরের হাতে বিধাতার পাস্‌পোর্ট আছে; সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু, এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব। সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য; সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না, অসুন্দরও না। কিন্তু, সেদিন করুণ-রসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল; প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম ক’রে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হল বাস্তব।

লক্ষপতির ঘরে মেজো মেয়ের বিবাহ। এমন ধুম পাড়ার অতিবৃদ্ধেরাও বলে অভূতপূর্ব। তার ঘোষণার তরঙ্গ খবরের কাগজের সংবাদবিথীকায় উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে। জনশ্রুতির কোলাহলে ঘটনাটা যতই গুরুতর প্রতিভাত হোক, তবু এই বহুব্যয়সাধ্য বিপুল সমারোহেও ব্যাপারটাকে “মেয়ের বিয়ে’ নামক সংবাদের নিতান্ত সাধারণতা থেকে উপরে তুলতে পারে না। সাময়িক উন্মুখরতার জোরে এ স্মরণীয় হয়ে ওঠে না। কিন্তু, “কন্যার বিবাহ’ নামক অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকে তার সাময়িক ও স্থানিক আত্মপ্রচারের আশুম্লানতা থেকে যদি কোনো কবি তাঁর ভাষায় ছন্দে দীপ্তিমান সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলেন, তা হলে প্রতিদিনের হাজার-লক্ষ মেয়ের বিবাহের কুহেলিকা ভেদ ক’রে এ দেখা দেবে একটি অদ্বিতীয় মেয়ের বিবাহরূপে, যেমন বিবাহ কুমারসম্ভবের উমার, যেমন বিবাহ রঘুবংশের ইন্দুমতীর। সাংকোপাঞ্জা ডন্‌কুইকসোটের ভৃত্যমাত্র, সংসারের প্রবহমান তথ্যপুঞ্জের মধ্যে তাকে তর্জমা করে দিলে সে চোখেই পড়বে না – তখন হাজার-লক্ষ চাকরের সাধারণ-শ্রেণীর মাঝখানে তাকে সনাক্ত করবে কে। ডন্‌কুইক্‌সোটের চাকর আজ চিরকালের মানুষের কাছে চিরকালের চেনা হয়ে আছে,

সবাইকে দিচ্ছে তার একান্ত প্রত্যক্ষতার আনন্দ; এ পর্যন্ত ভারতের যতগুলি বড়োলাট হয়েছে তাদের সকলের জীবনবৃত্তান্ত মেলালেও এই চাকরটির পাশে তারা নিষ্প্রভ। বড়ো বড়ো বুদ্ধিমান রাজনীতিকের দল মিলে অস্ত্রলাঘব ব্যাপার নিয়ে যে বাগবিতণ্ডা তুলেছেন তথ্যহিসাবে সে একটা মস্ত তথ্য; কিন্তু যুদ্ধে-পঙ্গু একটি-মাত্র সৈনিকের জীবন যে-বেদনায় জড়িত তাকে সুস্পষ্ট প্রকাশমান করতে পারলে সকল কালের মানুষ রাষ্ট্রনীতিকের গুরুতর মন্ত্রণা-ব্যাপারের চেয়ে তাকে প্রধান স্থান দেবে। এ কথা নিশ্চিত জানি, যে-সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল তখন রাষ্ট্রিক আর্থিক অনেক সমস্যা উঠেছিল যার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি প্রকাণ্ড উদ্‌বেগরূপে ছিল; কিন্তু সে-সমস্তের আজ চিহ্নমাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।

মানবের সামাজিক জগৎ দ্যুলোকের ছায়াপথের মতো। তার অনেকখানিই নানাবিধ অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শনের বহুবিস্তৃত নীহারিকায় অবকীর্ণ; তাদের নাম হচ্ছে সমাজ, রাষ্ট্র, নেশন, বাণিজ্য, এবং আরো কত কী। তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন। যুদ্ধ-নামক একটিমাত্র বিশেষ্যের তলায় হাজার হাজার ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়দাহকর দুঃখের জ্বলন্ত অঙ্গার বাস্তবতার অগোচরে ভস্মাবৃত। নেশন-নামক একটা শব্দ চাপা দিয়েছে যত পাপ ও বিভীষিকা তার আবরণ তুলে দিলে মানুষের জন্যে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। সমাজ-নামক পদার্থ যত বিচিত্র রকমের মূঢ়তা ও দাসত্বশৃঙ্খল গড়েছে তার স্পষ্টতা আমাদের চোখ এড়িয়ে থাকে; কারণ, সমাজ একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, তাতে মানুষের বাস্তবতার বোধ আমাদের মনে অসাড় করেছে – সেই অচেতনতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে রামমোহন রায়কে, বিদ্যাসাগরকে। ধর্ম-শব্দের মোহযবনিকার অন্তরালে যে-সকল নিদারুণ ব্যাপার সাধিত হয়ে থাকে তাতে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত সকল নরকের দণ্ডবিধিকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। ইস্কুলে ক্লাস-নামক একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব আছে; সেখানে ব্যক্তিগত ছাত্র অগোচর থাকে শ্রেণীগত সাধারাণতার আড়ালে, সেই কারণে যখন তাদের মন-নামক সজীব পদার্থ মুখস্থ-বিদ্যার পেষণে গ্রন্থের পাতার মধ্যে পিষ্ট ফুলের মতো শুকোতে থাকে, আমরা থাকি উদাসীন। গবর্মেন্টের

আমলাতন্ত্রনামক অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মানুষের ব্যক্তিগত সত্যবোধের বাহিরে; সেইজন্য রাষ্ট্রশাসনের হৃদয়সম্পর্কহীন নামের নীচে প্রকাণ্ড আয়তনের নির্দয়তা কোথাও বাধে না।

মানবচিত্তের এই-সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকাক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান করে তুলছে। রূপে সেই-সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত। এই ব্যক্তিপুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্যতত্ত্ব; এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্বপরিধিতে পরিব্যাপ্ত – আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে; আছে তার মনে, কিন্তু মনকে অতিক্রম ক'রে; তার বর্তমানকে অধিকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তিপুরুষ প্রতীয়মানরূপে যে-সীমায় অবস্থিত সত্যরূপে কেবলই তাকে ছাড়িয়ে যায়, কোথাও থামতে চায় না; তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত যে-রূপ আনন্দময়, যা মৃত্যুহীন। সেই-সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই-সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তিপুরুষ পরমপুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছে, যে পরমপুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে, সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তায়।

১৩৪০

সাহিত্যের তাৎপর্য

উদ্ভিদের দুই শ্রেণী, ওষধি আর বনস্পতি। ওষধি ক্ষণকালের ফসল ফলাতে ফলাতে ক্ষণে জন্মায়, ক্ষণে মরে। বনস্পতির আয়ু দীর্ঘ, তার দেহ বিচিত্র রূপে আকৃতিবান, শাখায়িত তার বিস্তার।

ভাষার ক্ষেত্রেও প্রকাশ দুই শ্রেণীর। একটাতে প্রতিদিনের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা লুপ্ত হয়ে যায়; ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদবহনে তার সমাপ্তি। আর-একটাতে প্রকাশের পরিণাম তার নিজের মধ্যেই। সে দৈনিক আশুপ্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিঃশেষিত হতে হতে মিলিয়ে যায় না। সে শাল-তমালেরই মতো; তার কাছ থেকে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ, বিচিত্র ফুলে ফলে পল্লবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে। এ'কেই আমরা ব'লে থাকি সাহিত্য।

ভাষার যোগে আমরা পরস্পরকে তথ্যগত সংবাদ জানাচ্ছি, তা ছাড়া জানাচ্ছি ব্যক্তিগত মনোভাব। ভালো লাগছে, মন্দ লাগছে, রাগ করছি, ভালোবাসছি, এটা যথাস্থানে ব্যক্ত না ক'রে থাকতে পারি নে। মূক পশুপাখিরও আছে অপরিণত ভাষা; তাতে কিছু আছে ধ্বনি, কিছু আছে ভঙ্গি; এই ভাষায় তারা পরস্পরের কাছে কিছু খবরও জানায়, কিছু ভাবও জানায়। মানুষের ভাষা তার এই প্রয়োগসীমা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সন্ধান ও যুক্তির জোরে তথ্যগত সংবাদ পরিণত হয়েছে বিজ্ঞানে। হবা-মাত্র তার প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত বন্ধন ঘুচে গেল। যে জগৎটা "আমি আছি' এইমাত্র ব'লে আপনাকে জানান দিয়েছে, মানুষ তাকে নিয়ে বিরাট জ্ঞানের জগৎ রচনা করলে। বিশ্বজগতে মানুষের যে-যোগটা ছিল ইন্দ্রিয়বোধের দেখাশোনায়, সেইটেকে জ্ঞানের যোগে বিশেষভাবে অধিকার ক'রে নিলে সকল দেশের সকল কালের মানুষের বুদ্ধি।

ভাবপ্রকাশের দিকেও মানুষের সেই দশা ঘটল। তার খুশি, তার দুঃখ, তার রাগ, তার ভালোবাসাকে মানুষ কেবলমাত্র প্রকাশ করল তা নয়, তাকে প্রকাশের উৎকর্ষ দিতে লাগল; তাতে সে আশু উদ্‌বেগের প্রবর্তনা ছাড়িয়ে গেল, তাতে মানুষ লাগালে ছন্দ, লাগালে সুর, ব্যক্তিগত বেদনাকে দিলে বিশ্বজনীন রূপ। তার আপন ভালোমন্দলাগার জগৎকে অন্তরঙ্গ ভাবে সকল মানুষের সাহিত্যজগৎ করে নিলে।

সাহিত্য শব্দটার কোনো ধাতুগত অর্থব্যাখ্যা কোনো অলংকারশাস্ত্রে আছে কিনা জানি না। ঐ শব্দটার যখন প্রথম উদ্ভাবন হয়েছিল তখন ঠিক কী বুঝে হয়েছিল তা নিশ্চিত বলবার মতো বিদ্যা আমার নেই। কিন্তু, আমি যাকে সাহিত্য বলে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না।

সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে। শাকসবজির খেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল-ফলানোর যোগ। ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের। সবজি খেতের শেষ উদ্দেশ্য খেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্যসংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে-উদ্দেশ্য তাকে এক হিসাবে সাহিত্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, মন তার সঙ্গে মিলতে চায় – সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানকার সঙ্গে যোগে মন খুশি হয়!

এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

ব্যবসাদার গোলাপ-জলের কারখানা করে, শহরের ছোট হাটে বিক্রি করতে পাঠায় ফুল। সেখানে ফুলের সৌন্দর্যমহিমা গৌণ, তার বাজারদরের হিসাবটাই মুখ্য। বলা বাহুল্য, এই হিসাবটাতে আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু রস নেই। ফুলের সঙ্গে অহৈতুক

মিলনে এই হিসাবের চিন্তাটা আড়াল তুলে দেয়। গোলাপ-জলের কারখানাটা সাহিত্যের সামগ্রী হল না। হতেও পারে কবির হাতে, কিন্তু মালেকের হাতে নয়।

সে অনেক দিনের কথা, বোটে চলেছি পদ্মায়। শরৎকালের সন্ধ্যা; সূর্য মেঘস্তবকের মধ্যে তাঁর শেষ ঐশ্বর্যের সর্বস্বাদন পণ ক'রে সদ্য অস্ত গেছেন। আকাশের নীরবতা অনির্বচনীয় শান্তরসে কানায় কানায় পূর্ণ; ভরা নদীতে কোথাও একটু চাঞ্চল্য নেই; স্তব্ধ চিক্কণ জলের উপর সন্ধ্যাভ্রের নানা বর্ণের দীপ্তিচ্ছায়া ম্লান হয়ে মিলিয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের তীরে দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য বালুচর প্রাচীন যুগান্তরের অতিকায় সরীসৃপের মতো পড়ে আছে। বোট চলেছে অন্য পারের প্রান্ত বেয়ে, ভাঙন-ধরা খাড়া পাড়ির তলা দিয়ে দিয়ে; পাড়ির গায়ে শত শত গর্তে গাঙশালিকের বাসা; হঠাৎ একটা বড়ো মাছ জলের তলা থেকে ক্ষণিক কলশব্দে লাফ দিয়ে উঠে বঙ্কিম ভঙ্গিতে তখনই তলিয়ে গেল। আমাকে চকিত আভাসে জানিয়ে দিয়ে গেল এই জলযবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দ জীবলোকে নৃত্যপর প্রাণের আনন্দের কথা, আর সে যেন নমস্কার নিবেদন করে গেল বিলীয়মান দিনান্তের কাছে। সেই মুহূর্তেই তপসিমাঝি চাপা আক্ষেপের সুরে সনিশ্বাসে বলে উঠল, "ও! মস্ত মাছটা।' মাছটা ধরা পড়েছে আর সেটা তৈরি হচ্ছে রান্নার জন্যে, এই ছবিটাই তার মনে জেগে উঠল; চার দিকের অন্য ছবিটা খণ্ডিত হয়ে দূরে গেল স'রে। বলা যেতে পারে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার সাহিত্য গেল নষ্ট হয়ে। আহারে তার আসক্তি তাকে আপন জঠরগহ্বরের কেন্দ্রে টেনে রাখল। আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না।

মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্যে এই মাছকে চাওয়া। কিন্তু, তার চেয়ে তার বড়ো চাওয়া, বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া – নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত-আলোকে-মহিমান্বিত দিনাবসানকে সমস্ত মনের সঙ্গে মিলিত করতে চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। বক দাঁড়িয়ে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে, সূর্য উঠছে আকাশে, আরক্ত রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে ঝলমল করে – এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ঐ বক কি চাইতে জানে। এই আশ্চর্য চাওয়ার

প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে। তাই ভর্তৃহরি বলেছেন, যে-মানুষ সাহিত্যসংগীতকলাবিহীন সে পশু, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ নেই এইমাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার মধ্যেই বদ্ধ – মানুষের চৈতন্য বিশ্বে মুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ।

আমি যে-টেবিলে বসে লিখছি তার এক ধারে এক পুষ্পপাত্রে আছে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, আর-একটাতে আছে ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা গন্ধরাজ। লেখবার কাজে এর প্রয়োজন নেই। এই অপ্রয়োজনের আয়োজনে আমার একটা আত্মসম্মানের ঘোষণা আছে মাত্র। ঐটেতে আমার একটা কথা নিরবে রয়ে গেছে; সে এই যে, জীবনযাত্রার প্রয়োজন আমার চার দিকে আপন নীরন্ধ্র প্রাচীর তুলে আমাকে আটক করে নি। আমার মুক্ত স্বরূপ আপনাকে প্রমাণ করছে ঐ ফুলের পাত্রে। চৈতন্য যার বন্দী, বিশ্বের সঙ্গে যথার্থ সাহিত্যলাভের মাঝখানে তার বাধা আছে – তার রিপু, তার দুর্বলতা, তার কল্পনাদৃষ্টির অন্ধতা। আমি বন্দী নই, আমার দ্বার খোলা, তার প্রমাণ দেবে ঐ অনাবশ্যক ফুল; ওর সঙ্গে যোগ বিশ্বের সঙ্গে যোগেরই একটি মুক্ত বাতায়ন। ওকে চেয়েছি সেই অহৈতুক চাওয়ার মানুষ যাতে মুক্ত হয় একান্ত আবশ্যিকতা থেকে। এই আপন নিষ্কাম সম্বন্ধটি স্বীকার করবার জন্যে মানুষের কত উদ্যোগ তার সংখ্যা নেই। এই কথাটাই ভালো করে প্রকাশ করবার জন্যে মানবসমাজে রয়েছে কত কবি, কত শিল্পী।

সদ্য-তৈরি নতুন মন্দির, চুনকাম-করা। তার চার দিকে গাছপালা। মন্দিরটা তার আপন শ্যামল পরিবেশের সঙ্গে মিলছে না। সে আছে উদ্ধত হয়ে, স্বতন্ত্র হয়ে। তার উপর দিয়ে কালের প্রবাহ বইতে থাক্, বৎসরের পর বৎসর এগিয়ে চলুক। বর্ষার জলধারায় প্রকৃতি তার অভিষেক করুক, রৌদ্রের তাপে তার বালির বাঁধন কিছু কিছু খসতে থাক্, অদৃশ্য শৈবালের বীজ লাগুক তার গায়ে এসে; তখন ধীরে ধীরে বন-প্রকৃতির রঙ লাগবে এর সর্বাঙ্গে, চারি দিকের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হতে থাকবে। বিষয়ী লোক আপনার চার দিকের সঙ্গে মেলে না, সে আপনাতে আপনি পৃথক; এমন-কি, জ্ঞানী লোকও মেলে না, সে স্বতন্ত্র; মেলে ভাবুক লোক। সে আপন ভাবরসে বিশ্বের দেহে আপন রঙ লাগায়,

মানুষের রঙ। স্বভাবত বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে তার বিশুদ্ধ প্রাকৃতিকতায় প্রকাশ পায়। কিন্তু, মানুষ তো কেবল প্রাকৃতিক নয়, সে মানসিক। মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে অর্থাৎ তার অ্যাসোশিয়েশনে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে। আদিযুগের মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নেই। প্রকৃতিকে আমাদের মানবভাবের যতই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।

আমাদের জাহাজ এসে লাগছে জাপান-বন্দরে। চেয়ে দেখলুম দেশটার দিকে – নতুন লাগল, সুন্দর লাগল। জাপানি এসে দাঁড়ালো ডেকের রেলিং ধরে। সে কেবল সুন্দর দেশ দেখলে না; সে দেখলে যে-জাপানের গাছপালা নদী পর্বত যুগে যুগে মানবমনের সংস্পর্শে বিশেষ রসের রূপ নিয়েছে সেটা প্রকৃতির নয়, সেটা মানুষের। এই রসরূপটি মানুষই প্রকৃতিকে দিয়েছে, দিয়ে তার সঙ্গে মানবজীবনের একান্ত সাহিত্য ঘটিয়েছে। মানুষের দেশ যেমন কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নয়, তা মানবিক, সেইজন্যে দেশ তাকে বিশেষ আনন্দ দেয় – তেমনি মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতায় আবৃত করছে, অধিকার করছে, তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশন্তি।

বাহিরে তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে, সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভুক্ত করতে। কেননা, রসের অনুভূতি প্রবল হলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা ক'রে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। আমরা যখনই বিশ্বের যে-কোন বস্তুকে বা ব্যাপারকে ভাবের চক্ষে দেখি তখনই সে আর যন্ত্রের দেখা থাকে না; ফোটোগ্রাফিক লেন্সের যে যথাতথ দেখা তার থেকে তার স্বতই প্রভেদ ঘটে। সেই প্রভেদটাকে অবিকল বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মায়ের চোখে

দেখা খোকার পায়ে ছোট্টো লাল জুতোকে জুতো বললে তাকে যথার্থ করে বলাই হয় না। মাকে তাই বলতে হল –

খোকা যাবে নায়ে,
লাল জুতুয়া পায়ে।

অভিধানের কোথাও এ শব্দ নেই। বৈষ্ণবপদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দিভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করেছেন, কেননা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়। ভাবের সাহিত্য মাত্রেই এমন একটা ভাষার সৃষ্টি হয় যে-ভাষা কিছু বা বলে, কিছু বা গোপন করে; কিছু যার অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে, বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলট-পালট ক'রে তবেই বস্তুবিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্টি হতে থাকে তাকে সে প্রকাশ করতে পারে। নইলে কবি বলবে কেন "দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়।' দেখবার আগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনাকে বাইরের জিনিস ক'রে না রেখে তাকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল যখন, কবি একটা অদ্ভুত কথা বললে, দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়। আগ্রহ যে পাখির মতন ধায় এটা মনের সৃষ্ট ভাষা, বিবরণের ভাষা নয়।

গোধূলিবেলার অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাইরে এল, এ ঘটনাটা বাহ্য ঘটনা এবং অত্যন্ত সাধারণ। কবি বললেন, নববর্ষার মেঘে বিদ্যুতের রেখা যেন দ্বন্দ্ব প্রসারিত করে দিয়ে গেল। এই উপমার যোগে বাহিরের ঘটনা আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। আমাদের অন্তরে মন এ'কে সৃষ্টির বিষয় করে তুলে আপন করে নিলে।

কোনো এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক কবির লিখিত কোনো-একটি শ্লোকের গদ্য অনুবাদ দিচ্ছি, ইংরেজি তর্জমার থেকে : আপেল গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঝুরুঝুরু বইছে শরতের হাওয়া; থর্‌থর্‌ ক'রে কেঁপে-ওঠা পাতার মধ্যে থেকে ঘুম আসছে অবতীর্ণ হয়ে

পৃথিবীর দিকে – ছড়িয়ে পড়ছে নদীর ধারার মতো। এই যে কম্পমান ডালপালার মধ্যে মর্মরমুখর স্নিগ্ধ হাওয়ায় নিঃশব্দ নদীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ঘুমের রাত্রি, এ আমাদের মনের রাত্রি। এই রাত্রিকে আমরা আপন ক'রে তুলে তবেই পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারি।

কোনো চীনদেশীয় কবি বলছেন –

পাহাড় একটানা উঠে গেছে বহুশত হাত উচ্চে;
সরোবর চলে গেছে শত মাইল,
    কোথাও তার ঢেউ নেই;
    বালি ধু ধু করছে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র;
শীতে গ্রীষ্মে সমান অক্ষুণ্ণ সবুজ দেওদার- বন;
নদীর ধারা চলেইছে, বিরাম নেই তার;
গাছগুলো বিশ হাজার বছর
আপন পণ সমান রক্ষা ক'রে এসেছে - -
হঠাৎ এরা একটি পথিকের মন থেকে
    জুড়িয়ে দিল সব দুঃখবেদনা,
একটি নতুন গান বানাবার জন্যে
    চালিয়ে দিল তার লেখনীকে।

মানুষের দুঃখ জুড়িয়ে দিল নদী পর্বত সরোবর। সম্ভব হয় কী ক'রে। নদী-পর্বতের অনেক প্রাকৃতিক গুণ আছে কিন্তু সান্ত্বনার মানসিক গুণ তো নেই। মানুষের আপন মন তার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে নিজের সান্ত্বনা সৃষ্টি করে। যা বস্তুগত জিনিস তা মানুষের মনের স্পর্শে তারই মনের জিনিস হয়ে ওঠে। সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে মানুষের মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকে সাহিত্য জাগে।

বিশ্বের সঙ্গে এই মিলনটি সম্পূর্ণ অনুভব করার এবং ভোগ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কারণ, যে-শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে-শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক'রে তাকে মনোময় ক'রে তুলতে পারে। এই লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ। যখন মানুষ বলে "কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' তখন বুঝতে হবে, যে-মানুষকে মন দিয়ে নিজেরই ভাবরসে আপন ক'রে তুলতে হয় তাকেই আপন করা হয় নি – সেইজন্যে "হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।' মন তাকে মনের ক'রে নিতে পারে নি ব'লেই বাইরে বাইরে ঘুরছে। মানুষের বিশ্ব মানুষের মনের বাইরে যদি থাকে সেটাই নিরানন্দের কারণ হয়। মন যখন তাকে আপন ক'রে নেয় তখনই তার ভাষায় শুরু হয় সাহিত্য, তার লেখনী বিচলিত হয় নতুন গানের বেদনায়।

মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত। নানা অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে বিশ্ব জুড়ে মানবলোকে হৃদয়াবেগের ঢেউখেলা চলেছে। সমগ্র ক'রে, একান্ত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে তাকে দেখার দুটি মস্ত ব্যাঘাত আছে। পর্বত বা সরোবর বিরাজ করে অক্রিয় অর্থাৎ প্যাসিভ্‌ভাবে; আমাদের সঙ্গে তাদের যে-ব্যবহার সেটা প্রাকৃতিক, তার মধ্যে মানসিক কিছু নেই, এইজন্যে মন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে আপন ভাবে ভাবিত করতে পারে সহজেই। কিন্তু, মানবসংসারের বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের মনের যে-সম্পর্ক ঘটে সেটা সক্রিয়। দুঃশাসনের হাতে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে-অসম্মান ঘটেছিল তদনুরূপ ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে তা হলে তাকে আমরা মানবভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো ক'রে দেখতে পারি নে। নিত্যঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমায় বিচ্ছিন্ন একটা অন্যায় ব্যাপার ব'লেই তাকে জানি, সে একটা পুলিশ-কেস রূপেই আমাদের চোখে পড়ে – ঘৃণার সঙ্গে ধিক্কারের সঙ্গে প্রাত্যহিক সংবাদ-আবর্জনার মধ্যে তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলি। মহাভারতের খাণ্ডববন-দাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে – সেই দূরত্ববশত সে

অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি ক'রেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন ক'রে সে দেখে পর্বতকে সরোবরকে। কিন্তু, যদি খবর পাই, অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শস্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে শত শত মানুষ পশুপক্ষী, তবে সেটা আমাদের করুণা অধিকার কঁরে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।

মানবঘটনাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখবার আর-একটি ব্যাঘাত আছে। সংসারে অধিকাংশ স্থলেই ঘটনাগুলি সুসংলগ্ন হয় না, তার সমগ্রতা দেখতে পাই নে। আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্যস্থাপন করে। পাড়ায় কোনো দুঃশাসনের দৌরাত্ম হয়তো জেনেছি বা খবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু, এই ঘটনাটি তার পূর্ববর্তী পরবর্তী দূর-শাখা-প্রশাখাবর্তী একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডিকে অধিকার ক'রে হয়তো রয়েছে – আমাদের সামনে সেই ভূমিকাটি নেই – এই ঘটনাটি হয়তো সমস্ত বংশের মধ্যে পিতামাতার চরিত্রের ভিতর দিয়ে অতীতের মধ্যেও প্রসারিত, কিন্তু সে আমাদের কাছে অগোচর। আমরা তাকে দেখি টুকরো টুকরো ক'রে, মাঝখানে বহু অবান্তর বিষয় ও ব্যাপারের দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন; সমস্ত ঘটনাটির সম্পূর্ণতার পক্ষে তাদের কোন্‌গুলি সার্থক, কোন্‌গুলি নিরর্থক, তা আমরা বাছাই ক'রে নিতে পারি নে। এইজন্যে তার বৃহৎ তাৎপর্য ধরা পড়ে না। যাকে বলছি বৃহৎ তাৎপর্য তাকে যখন সমগ্র ক'রে দেখি তখনই সাহিত্যের দেখা সম্ভব হয়। ফরাসি-রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রতিদিন যে-সকল খণ্ড খণ্ড ঘটনা ঘটছিল সেদিন তাদের চরম অর্থকেই বা দেখতে পেয়েছে; কার্লাইল তাদের বাছাই ক'রে নিয়ে আপনার কল্পনার পটে সাজিয়ে একটি সমগ্রতার ভূমিকায় যখন দেখালেন, তখন আমাদের মন এই-সকল বিচ্ছিন্নকে নিরবচ্ছিন্নরূপে অধিকার করতে পেরে নিকটে পেলে। খাঁটি ইতিহাসের পক্ষ থেকে তাঁর বাছাইয়ে অনেক দোষ থাকতে পারে, অনেক অত্যুক্তি অনেক উনোক্তি হয়তো আছে এর মধ্যে; বিশুদ্ধ তথ্যবিচারের পক্ষে যে-সব দৃষ্টান্ত অত্যাবশ্যক তার হয়তো অনেক বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু, কার্লাইলের রচনায় যে সুনিবিড় সমগ্রতার ছবি আঁকা হয়েছে তার উপরে আমাদের মন অব্যবহিতভাবে যুক্ত ও ব্যাপ্ত হতে

বাধা পায় না; এইজন্যে ইতিহাসের দিক থেকে যদি বা সে অসম্পূর্ণ হয় তবু সাহিত্যের দিক থেকে সে পরিপূর্ণ।

এই বর্তমানকালেই আমাদের দেশে চার দিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে রাষ্ট্রিক উদ্যোগের নানা প্রয়াস নানা ঘটনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। ফৌজদারি শাসনতন্ত্রের বিশেষ বিশেষ আইনের কোঠায় তাদের বিবরণ শুনছি সংবাদপত্রের নানাজাতীয় আশুবিলীয়মান মর্মরধ্বনির মধ্যে। ভারতবর্ষের এ যুগের সমগ্র রাষ্ট্ররূপের মধ্যে, তাদের পূর্ণভাবে দেখবার সুযোগ হয় নি; যখন হবে তখন তারা মানুষের সমস্ত বীর্য, সমস্ত বেদনা, সমস্ত ব্যর্থতা বা সার্থকতা, সমস্ত ভুলত্রুটি নিয়ে সংবাদপত্রের ছায়ালোক থেকে উঠবে সাহিত্যের জ্যোতিষ্কলোকে। তখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট, আইনের বই, পুলিশের যষ্টি, সমস্ত হবে গৌণ; তখন আজকের দিনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছোটোবড়ো দ্বন্দ্ববিরোধ একটা বৃহৎ ভূমিকায় ঐক্য লাভ ক'রে নিত্যকালের মানবমনে বিরাটমূর্তিতে প্রত্যক্ষ হবার অধিকারী হবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাত নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা বিচিত্র হয়ে চলেছে। সে একটা মানসজগৎ, বহু যুগের রচনা। তাকে আমরা নৃতত্ত্বের দিক থেকে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে, ঐতিহাসিক দিক থেকে, বিচার ক'রে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। সে হল তথ্য-সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ। কিন্তু, এই অভিজ্ঞতার জগতে আমরা প্রকাশবৈচিত্র্যবান মানুষের নৈকট্য কামনা করি। এই চাওয়াটা আমাদের মনে অত্যন্ত গভীর ও প্রবল। শিশুকাল থেকে মানুষ বলেছে "গল্প বলো'; সেই গল্প তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো-একটা মানবপরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে। রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, দুর্লভের সন্ধানে দুঃসাধ্য উদ্যম, মন্দের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, ঈর্ষায় তার বিঘ্ন, এ-সমস্ত হৃদয়বোধ নানা অবস্থায় নানা আকারে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে; এর কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের, এদের সাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপকথায় ছেলেদের জন্যে জোগানো হচ্ছে আদিকাল থেকে। এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে, কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক। আছে দৈত্য-দানব, বস্তুত

তারা মানুষ; ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি, তারাও তাই। এই-সব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শিশুমনের জগৎ-রূপে দেখা দেয়; শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে। মানুষ যে স্বভাবত সৃষ্টিকর্তা তাই সে সব-কিছুকে আপন সৃষ্টিতে পরিণত ক'রে তাতে বাসা বাঁধে; নিছক বিধাতার সৃষ্টিতে তাকে কুলোয় না। মানুষ আপন হাতে আপনাকে, আপন সংসারকে তৈরী করে, সেই সংসারের ছবি বানায় আপন হাতে – তাতে তাকে নিবিড় আনন্দ দেয়, কেননা সেই ছবি তার মনের নিতান্ত কাছে আসে। যে-শকুন্তলার ঘটনা মানব সংসারে ঘটতে পারে তাকেই কবি আমাদের মনের কাছে নিবিড়তর সত্য করে দেখিয়ে দেন। রামায়ণ রচিত হল,রচিত হল মহাভারত। রামকে পেলুম; সে তো একটিমাত্র মানুষের রূপ নয়, অনেক কাল থেকে অনেক মানুষের মধ্যে যে-সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে সে-সমস্তই দানা বেঁধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠলেন আমাদের মনের মানুষ। বাস্তব সংসারে অনেক বিক্ষিপ্ত ভালো লোকের চেয়ে রামচন্দ্র আমাদের মনের কাছে সত্যমানুষ হয়ে উঠেন। মন তাঁকে যেমন কণ্ঠরে স্বীকার করে প্রত্যক্ষ হাজার হাজার লোককে তেমন কণ্ঠরে স্বীকার করে না। মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। সংসারে মন্দ লোকও আছে ছড়িয়ে, নানা-কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে; আমাদের পাঁচ-মিশোলি অভিজ্ঞতার মধ্যে তাদের মন্দত্ব অসংলগ্ন হয়েই দেখা দেয়। সেই বহু লোকের বহুবিধ মন্দত্বের খণ্ড খণ্ড পরিচয় সংসারে আমাদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে; তারা আসে, তারা যায়, তারা আঘাত করে, নানা ঘটনায় চাপা পড়ে তারা অগোচর হতে থাকে। সাহিত্যে তারা সংহত আকারে ঐক্য লাভ কণ্ঠরে আমাদের নিত্যমনের সামগ্রী হয়ে ওঠে; তখন তাদের আর ভুলতে পারি নে। শেক্‌স্‌পীয়রের রচিত ফল্‌স্‌টাফ্ একটি বিশিষ্ট মানুষ সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক মানুষের কিছু কিছু আভাস আছে, শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার গুণে তাদের সমবায় ঘনীভূত হয়েছে ফল্‌স্‌টাফ্ চরিত্রে। জোড়া লাগিয়ে তৈরী নয়, কল্পনার রসে জারিত কণ্ঠরে তার সৃষ্টি; তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল খুব সহজ, এই জন্যে তাতে আমাদের আনন্দ।

এমন কথা মনে হতে পারে, সাবেক-কালের কাব্য-নাটকে আমরা যাদের দেখতে পাই তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত; তাই তারা একই-জাতীয় অনেকগুলি মানুষের ভাঙাচোরা উপকরণ নিয়ে তৈরী। কিন্তু, আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা যে-চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত।

প্রথম কথা এই যে, ব্যক্তিগত মানুষেরও শ্রেণীগত ভিত্তি আছে, একান্ত শ্রেণীবিচ্ছিন্ন মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে বহু মানুষ, আর সেই সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ যে বিশেষ। চরিত্রসৃষ্টিতে শ্রেণীকে লঘু কঞ্চরে ব্যক্তিকেই যদিবা প্রাধান্য দিই তবু সেই ব্যক্তিকে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অধিগম্য করতে হলে তাতে আর্টিস্টের হাত পড়া চাই। এই আর্টিষ্টের সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে না। এই সৃষ্টিতে যে-মানুষকে দেখি, প্রকৃতির হাতে যদি সে তৈরী হত তা হলে তার মধ্যে আনেক বাহুল্য থাকত; সে বাস্তব যদি হত তবুও সত্য হত না, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় তাকে নিঃসংশয় প্রামাণিক বঞ্চলে মানত না। তার মধ্যে অনেক ফাঁক থাকত, অনেক-কিছু থাকত যা নিরর্থক, আগে-পিছের ওজন ঠিক থাকত না। তার ঐক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হত না। শতদল পদ্মে যে-ঐক্য দেখে আমরা তাকে মুহূর্তেই বলি সুন্দর, তা সহজ – তার সংকীর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথাও পরস্পর দ্বন্দ্ব নেই, এমন-কিছু নেই যা অযথা; আমাদের হৃদয় তাকে অধিকার করতে পারে অনায়াসে, কোথাও বাধা পায় না। মানুষের সংসারে দ্বন্দ্ব বহুল বৈচিত্র্যে অমাদের উদ্‌ভ্রান্ত কঞ্চরে দেয়। যদি তার কোন একটি প্রকাশকে স্পষ্টরূপে হৃদয়গম্য করতে হয় তা হলে আর্টিস্টের সুনিপুণ কল্পনা চাই। অর্থাৎ , বাস্তবে যা আছে বাইরে তাকে পরিণত কঞ্চরে তুলতে হবে মনের জিনিস কঞ্চরে । আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর – সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশমত। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে, কোনোটাকে কমাতে; কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে, কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন কঞ্চরে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ কঞ্চরে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মঙ্গম নৈকট্য দিতে হবে; সেই নৈকট্য ঘটায় বঞ্চলেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।

মানুষ যে-বিশ্বে জন্মেছে, তাকে দুই দিক থেকে কেবলই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে, ব্যবহারের দিক থেকে আর ভাবের দিক থেকে। আগুন যেখানে প্রচ্ছন্ন সেখানে মানুষ জ্বালল আগুন নিজের হাতে; আকাশের আলো যেখানে অগোচর সেখানে সে বৈদ্যুতিক আলোককে প্রকাশ করলে নিজের কৌশলে; প্রকৃতি আপনি যে-ফলমূল-ফসল বরাদ্দ করে দিয়েছে তার অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতা সে দূর করেছে নিজের লাঙলের চাষে; পর্বতে অরণ্যে গুহাগহ্বরে সে বাস করতে পারত, করে নি – সে নিজের সুবিধা ও রুচি-অনুসারে আপন বাসা আপনি নির্মাণ করেছে। পৃথিবীকে সে অযাচিত পেয়েছিল। কিন্তু, সে পৃথিবী তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ খায় নি; তাই আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানব বুদ্ধিকৌশলে আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী কণ্ঢরে তুলছে – সেজন্যে তার কত কলবল, কত নির্মাণনৈপুণ্য। এখানকার জলে স্থলে আকাশে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ আপন ইচ্ছাকে প্রসারিত কণ্ঢরে দিচ্ছে। উপকরণ পাচ্ছে সেই পৃথিবীর কাছ থেকে, শক্তি ধার করছে তারই গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ কণ্ঢরে। সেগুলিকে আপন পথে আপন মতে চালনা কণ্ঢরে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়ে দিচ্ছে। মানুষের নগরপল্লী, উদ্যান, শষ্যক্ষেত্র, উদ্যান, হাট-ঘাট, যাতায়াতের পথ, প্রকৃতির সহজ অবস্থাকে ছাপিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়ানো ধনকে মানুষ এক করেছে, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সে সংহত করেছে; এমনি করে দেশ-দেশান্তরে পৃথিবী ক্রমশই অভিভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করে আসছে মানুষের কাছে। মানুষের বিশ্বজয়ের এই একটা পালা বস্তুজগতে; ভাবের জগতে তার আছে আর-একটা পালা। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে একদিকে তার জয়স্তম্ভ, আর-একদিকে শিল্পে সাহিত্যে।

যেদিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেই দিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করছে তার ভাবগম্য জগৎকে। তার স্বরচিত ব্যাবহারিক জগতে যেমন এখানেও তেমনি; অর্থাৎ তার চার দিকে যা-তা যেমন- তেমন ভাবে রয়েছে তাকেই সে অগত্যা স্বীকার করে নেয় নি।

কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে,হৃদয় দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে, যাতে সে মানুষের মনের জিনিস হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ।

ভাবের জগৎ বলতে আমরা কী বুঝি। হৃদয় যাকে উপলব্ধি করে বিশেষ রসের যোগে; অনতিলক্ষ্য বহু অবিশেষের মধ্য থেকে কল্পনার দৃষ্টিতে যাকে আমরা বিশেষ কঞ্চরে লক্ষ্য করি; সেই উপলব্ধি করা, সেই লক্ষ্য করাটাই যেখানে চরম বিষয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলছি, জ্যোৎস্নারাত্রি। সে রাত্রির বিশেষ একটি রস আছে, মনকে তা অধিকার করে। শুধু রস নয়,রূপ আছে তার – দেখি তা কল্পনার চোখে। গাছের ডালে, বনের পথে, বাড়ির ছাদে, পুকুরের জলে নানা ভঙ্গিতে তার আলোছায়ার কোলাকুলি। সেই সঙ্গে নানা ধ্বনির মিলন – পাখির বাসায় হঠাৎ পাখা ঝাড়ার শব্দ, বাতাসে বাঁশপাতার ঝর্ঝরানি,অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঝোপের মধ্য থেকে উঠছে ঝিল্লিধ্বনি, নদী থেকে শোনা যায় ডিঙি চলেছে তারই দাঁড়ের ঝপ্ঝপ্ , দূরে কোন্ বাড়িতে কুকুরের ডাক। বাতাসে অদেখা অজানা ফুলের মৃদু গন্ধ যেন পা টিপে টিপে চলেছে, কখনো তারই মাঝে মাঝে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে জানা ফুলের পরিচয়। বহু প্রকারের স্পষ্ট ও অস্পষ্টকে এক করে নিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রির একটা স্বরূপ দেখতে পায় আমাদের কল্পনার দৃষ্টি। এই কল্পনা-দৃষ্টিতে বিশেষ কঞ্চরে সমগ্র কঞ্চরে দেখার জ্যোৎস্নারাত্রি মানুষের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি জিনিস। তাকে নিয়ে মানুষের সেই অত্যন্ত কাছে পাওয়ার, মিলে যাওয়ার আনন্দ।

গোলাপ-ফুল অসামান্য; সে আপন সৌন্দর্যেই আমাদের কাছে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, সে স্বতই আমাদের মনের সামগ্রী। কিন্তু, যা সামান্য, যা অসুন্দর, তাকে আমাদের মন কল্পনার ঐক্যদৃষ্টিতে বিশিষ্ট কঞ্চরে দেখাতে পারে; বাইরে থেকে তাকে আতিথ্য দিতে পারে ভিতরের মহলে। জঙ্গলে-আবিষ্ট ভাঙা মেটে পাঁচিলের গা থেকে বাগ্দি বুড়ি বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে ঘুঁটে সংগ্রহ কঞ্চরে আপন ঝুড়িতে তুলছে , আর পিছনে পিছনে তার পোষা নেড়ি কুকুরটা লাফালাফি করে বিরক্ত করছে – এই ব্যাপারটি যদি বিশিষ্ট স্বরূপ নিয়ে আমাদের চোখে পড়ে, একে যদি তথ্যমাত্রের সামান্যতা থেকে পৃথক কঞ্চরে এর নিজের অস্তিত্বগৌরবে দেখি, তা হলে এও জায়গা নেবে ভাবের নিত্যজগতে।

বস্তুত, আর্টিস্টরা বিশেষ আনন্দ পায় এইরকম সৃষ্টিতেই। যা সহজেই সাধারণের চোখ ভোলায় তাতে তার নিজের সৃষ্টির গৌরব জোর পায় না। যা আপনিই ডাক দেয় না তার মুখে সে আমন্ত্রণ জাগিয়ে তোলে; বিধাতার হাতের পাসপোর্ট নেই যার কাছে তাকে সে উত্তীর্ণ কণ্ডরে দেয় মনোলোকে। অনেক সময় বড়ো আর্টিস্ট অবজ্ঞা করে সহজ মনোহরকে আপন সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে। মানুষ বস্তুজগতের উপর আপন বুদ্ধিকৌশল বিস্তার কণ্ডরে নিজের জীবনযাত্রার একান্ত অনুগত একটি ব্যাবহারিক জগৎ সর্বদাই তৈরি করতে লেগেছে। তেমনি মানুষ আপন ইন্দ্রিয়বোধের জগৎকে পরিব্যাপ্ত কণ্ডরে বিচিত্র কলাকৌশলে আপন ভাবরসভোগের জগৎ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত। সেই তার সাহিত্য। ব্যাবহারিক বুদ্ধিনৈপুণ্যে মানুষ কলে বলে কৌশলে বিশ্বকে আপন হাতে পায়, আর কলানৈপুণ্যে কল্পনাশক্তিতে বিশ্বকে সে আপন কাছে পায়। প্রয়োজন-সাধনে এর মূল্য নয়; এর মূল্য আত্মীয়তাসাধনে, সাহিত্যসাধনে।

একবার সেকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে তখনকার দিনের মনোভাবের পরিচয় আছে একটি কাহিনীতে; সেটা আলোচনার যোগ্য। ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে ব্যাধ যখন হত্যা করলে তখন ঘৃণার আবেগে কবির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ ছন্দ সহসা উচ্চারিত হল।

কল্পনা করা যাক, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে সহসা জ্যোতি উঠল জেগে। এই জ্যোতির আছে অফুরান বেগ, আছে প্রকাশশক্তি। স্বতই প্রশ্ন উঠল, অনন্তের মধ্যে এই জ্যোতি নিয়ে কি করা যাবে। তারই উত্তরে জ্যোতিরাত্মক অণুপরমাণুর সংঘ নিত্য-অভিব্যক্ত বিচিত্র রূপ ধরে আকাশে আকাশে আবর্তিত হয়ে চলল – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহিমা সেই আদিজ্যোতিরই উপযুক্ত।

কবিঋষির মনে যখন সহসা সেই বেগবান শক্তিমান ছন্দের আবির্ভাব হল তখন স্বতই প্রশ্ন জাগল, এরই উপযুক্ত সৃষ্টি হওয়া চাই। তারই উত্তরে রচিত হল রামচরিত।

অর্থাৎ, এমন-কিছু যা নিত্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য। যার সান্নিধ্য অর্থাৎ যার সাহিত্য মানুষের কাছে আদরণীয়।

মানুষের নির্মাণশক্তি বলশালী, আশ্চর্য তার নৈপুণ্য। এই শক্তি নিয়ে, এই নৈপুণ্য নিয়ে, সে বড়ো বড়ো নগর নির্মাণ করেছে। এই নগরের মূর্তি যেন মানুষের গৌরব করবার যোগ্য হয়, এ কথা সেই জাতির মানুষ না ইচ্ছা কণ্ঞরে থাকতে পারে নি যাদের শক্তি আছে, যাদের আত্মসন্মানবোধ আছে, যারা সভ্য। সাধারণত সেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা রিপু এসে ব্যাঘাত ঘটায় – মুনাফা করবার লোভ আছে, সস্তায় কাজ সারবার কৃপণতা আছে, দরিদ্রের প্রতি ধনী কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য আছে,অশিক্ষিত বিকৃতরুচি বর্বরতাও এসে পড়ে এর মধ্যে; তাই নির্লজ্জ নির্মমতায় কুৎসিত পাটকল উঠে দাঁড়ায় গঙ্গাতীরের পবিত্র শ্যামলতাকে পদদলিত কণ্ঞরে, তাই প্রাসাদশ্রেণীর অন্তরালে নানা জাতীয় দুর্‌দৃশ্য বস্তিপাড়া অস্বাস্থ্য ও অশোভনতাকে পালন করতে থাকে আপন কলুষিত আশ্রয়ে, যেমন-তেমন কদর্যভাবে যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ী তেলকল নোংরা দোকান গলিঘুঁজি চোখের ও মনের পীড়া বিস্তারপূর্বক দেশে ও কালে আপন স্বত্বাধিকার পাকা করতে থাকে। কিন্তু, রিপুর প্রবলতা ও অক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপে এই-সমস্ত ব্যত্যয়কে স্বীকার কণ্ঞরে তবুও মোটের উপরে এ কথা মানতে হবে যে, সমস্ত শহরটা শহরবাসীর গৌরব করবার উপযুক্ত যাতে হয় এই ইচ্ছাটাই সত্য। কেউ বলবে না, শহরের সত্য তার কদর্য বিকৃতিগুলো। কেননা, শহরের সঙ্গে শহরবাসীর অত্যন্ত নিকটের যোগ; সে যোগ স্থায়ী যোগ,সে যোগ আত্মীয়তার যোগ, এমন যোগ নয় যাতে তার আত্মাবমাননা।

সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলা চলে। তার মধ্যে রিপুর এই আক্রমণ এসে পড়ে, ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার নানা চিহ্ন দেখা দিতে থাকে, মলিনতার কলঙ্ক লাগতে থাকে যেখানে-সেখানে; কিন্তু তবু সকল হীনতা-দীনতাকে ছাড়িয়ে উঠে যে-সাহিত্য সমগ্র ভাবে মানুষের মহিমা প্রকাশ না হয় তাকে নিয়ে গৌরব করা চলবে না, কেননা সাহিত্যে মানুষ আপনারই সঙ্গকে, আপনার সাহিত্যকে প্রকাশ করে স্থায়িত্বের উপাদানে। কেননা চিরকালের মানুষ বাস্তব নয়, চিরকালের মানুষ ভাবুক; চিরকালের মানুষের মনে যে-

আকাঙক্ষা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কাজ করেছে তা অভ্রভেদী, তা স্বর্গাভিমুখী, তা অপরাহত পৌরুষের তেজে জ্যোতির্ময়। সাহিত্য সেই পরিচয়ের ক্ষীণতা যদি কোনো ইতিহাসে দেখা যায় তা হলে লজ্জা পেতে হবে; কেননা সাহিত্য মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে। এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো; তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল, তার ভাবীকালের গৃহের প্রদীপ।

শান্তিনিকেতন, ১২| ৭| ৩৪

কবির অভিভাষণ

এই পরিষদে১ কবির অভ্যর্থনা পূর্বেই হয়ে গেছে। সেই কবি বৈদেহিক; সে বাণীমূর্তিতে ভাবরূপে সম্পূর্ণ। দেহের মধ্যে তার প্রকাশ সংকীর্ণ এবং নানা অপ্রাসঙ্গিক উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত।

আমার বন্ধু২ এইমাত্র যমের সঙ্গে কবির তুলনা ক'রে বলেছেন, যমরাজ আর কবিরাজ দুটি বিপরীত পদার্থ। বোধহয় তিনি বলতে চান, যমরাজ নাশ করে আর কবিরাজ সৃষ্টি করে। কিন্তু, এরা উভয়েই যে এক দলের লোক, একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত, সে কথা অমন ক'রে চাপা দিলে চলবে কেন।

নাটকসৃষ্টির সর্বপ্রধান অংশ তার পঞ্চম অঙ্কে। নাটকের মধ্যে যা-কিছু চঞ্চল তা ঝরে পড়ে গিয়ে তার যেটুকু স্থায়ী সেইটুকুই পঞ্চম অঙ্কের চরম তিরস্করণীর ভিতর দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। বিশ্বনাট্যসৃষ্টিতেও পঞ্চম অঙ্কের প্রাধান্য ঋষিরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন- সেইজন্য সৃষ্টিলীলায় অগ্নি, সূর্য, বৃষ্টিধারা, বায়ুর নাট্যনৈপুণ্য স্বীকার ক'রে সব শেষে বলেছেন, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ইনি না থাকলে যা-কিছু ক্ষণকালের তাই জমে উঠে যেটি চিরকালের তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। যেটা স্থূল, যেটা স্থাবর, সেটাকে ঠেলে ফেলবার কাজে মৃত্যু নিয়ত ধাবমান।

ভয়াদস্যারিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

এই যদি হয় যমরাজের কাজ, তবে কবির কাজের সঙ্গে এর মিল আছে বৈকি। ক্ষণকালের তুচ্ছতা থেকে, জীর্ণতা থেকে, নিত্যকালের আনন্দরূপকে আবরণমুক্ত ক'রে দেখাবার ভার কবির। সংসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অঙ্কে নানাপ্রকার কাজের

লোক নানাপ্রকার প্রয়োজনসাধনে প্রবেশ করেন; কিন্তু কবি আসেন “পঞ্চমঃ’; আশু প্রয়োজনের সদ্যঃপাতী আয়োজনের যবনিকা সরিয়ে ফেলে অহৈতুকের রসস্বরূপকে বিশুদ্ধ ক’রে দেখাতে।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশ পাচ্ছে, জলে স্থলে, ফুলে ফলে, বর্ণে গন্ধে, রূপে সংগীতে নৃত্যে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে। কবির কাব্যেও সেই বাণীরই ধারা। যে চিত্তযন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই বাণী ধ্বনিত, তার প্রকৃতি অনুসারে এই প্রকাশ আপন বিশেষত্ব লাভ করে। এই বিশেষত্বই অসীমকে বিচিত্র সীমা দেয়। এই সীমার সাহায্যেই সীমার অতীতকে আপন ক’রে নিয়ে তার রস পাই। এই আপন ক’রে নেওয়াটি ব্যক্তিভেদে কিছু-না-কিছু ভিন্নতা পায়। তাই একই কাব্য কত লোকে আপন মনে কতরকম ক’রে বুঝেছে। সেই বোঝার সম্পূর্ণতা কোথাও বেশি, কোথাও কম, কোথাও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কোথাও অশুদ্ধ। প্রকাশের উৎকর্ষেও যেমন তারতম্য, উপলব্ধির স্পষ্টতাতেও তেমনি। এইজন্যেই কাব্য বোঝবার আনন্দেরও সাধনা করতে হয়।

এই বোঝবার কাজে কেউ কেউ কবির সাহায্য চেয়ে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে, যে-কবি কাব্য লেখেন তিনি এক মানুষ, আর যিনি ব্যাখ্যা করেন তিনি আর-এক জন। এই ব্যাখ্যাকর্তা পাঠকদেরই সমশ্রেণীয়। তাঁর মুখে ভুল ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়।

আমার কাব্য ঠিক কী কথাটি বলছে, সেটি শোনবার জন্যে আমাকে বাইরে যেতে হবে– যাঁরা শুনতে পেয়েছেন তাঁদের কাছে। সম্পূর্ণ ক’রে শোনবার ক্ষমতা সকলের নেই। যেমন অনেক মানুষ আছে যাদের গানের কান থাকে না– তাদের কানে সুরগুলো পৌঁছয়, গান পৌঁছয় না, অর্থাৎ সুরগুলির অবিচ্ছিন্ন ঐক্যটি তারা স্বভাবত ধরতে পারে না। কাব্য সম্বন্ধে সেই ঐক্যবোধের অভাব অনেকেরই আছে। তারা যে একেবারেই কিছু পায় না তা নয়– সন্দেশের মধ্যে তারা খাদ্যকে পায়, সন্দেশকেই পায় না। সন্দেশ চিনি-ছানার চেয়ে অনেক বেশি, তার মধ্যে স্বাদের যে সমগ্রতা আছে সেটি পাবার জন্যে রসবোধের শক্তি

থাকা চাই। বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা, চর্চার দ্বারা, এই সমগ্রতার অনির্বচনীয় রসবোধের শক্তি পরিণতি লাভ করে। যে-ব্যক্তি সেরা যাচনদার এক দিকে তার স্বাভাবিক সূক্ষ্ম অনুভূতি, আর-এক দিকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা, দুয়েরই প্রয়োজন।

এই কারণেই এই-যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার সার্থকতা আছে। এখানে কয়েকজন যে একত্র হয়েছেন তার একটিমাত্র কারণ, কাব্য থেকে তাঁরা কিছু-না-কিছু শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা উদাসীন নন। এই পরস্পরের শোনা নানা দিক থেকে মিলিয়ে নেবার আনন্দ আছে। আর, যাঁরা স্বভাবশ্রোতা, যাঁরা সম্পূর্ণকে সহজে উপলব্ধি করেন, তাঁরা এই পরিষদে আপন যোগ্য আসনটি লাভ করতে পারবেন।

এই পরিষদটি যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কবির পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সুযোগ, পাঠকের শ্রদ্ধা। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের প্রধান সহায় প্রমাণ, রসসৃষ্টি-পদার্থের প্রধান সহায় শ্রদ্ধা। সুন্দরকে দেখবার পক্ষে অশ্রদ্ধার মতো অন্ধতা আর নেই। এই বিশ্বরচনায় সুন্দরের ধৈর্য অপরিসীম। চিত্তে যখন উপেক্ষা, শ্রদ্ধা যখন অসাড়, তখনো প্রভাতে সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে সুন্দর আসেন, কোনো অর্ঘ্য না নিয়ে চলে যান, তাঁকে যে গ্রহণ করতে না পারলে সে জানতেও পারে না যে সে বঞ্চিত। যুগে যুগে মানুষের সৃষ্টিতেও এমন ঘটনা ঘটেছে, অশ্রদ্ধার অন্ধকার রাত্রে সুন্দর অলক্ষ্যে এসেছেন, দীপ জ্বালা হয় নি, অলক্ষ্যে চলে গিয়েছেন। সাহিত্যে ও কলারচনায় আজ আমাদের যে সঞ্চয় তা যুগযুগান্তরের বহু অপচয়ের পরিশিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। অনেক অতিথি ফিরে যায় রুদ্ধদ্বারে বৃথা আঘাত ক'রে, কেউ-বা দৈবক্রমে এসে পড়ে যখন গৃহস্থ জেগে আছে। কেউ-বা অনেক দ্বার থেকে ফিরে গিয়ে হঠাৎ দেখে একটা গৃহের দ্বার খোলা। আমার সৌভাগ্য এই যে, এখানে দ্বার খোলা পেয়েছি, আহ্বান শুনতে পাচ্ছি “এসো’। এই পরিষদ আমাকে শ্রদ্ধার আসন দেবার জন্য প্রস্তুত; স্বদেশের আতিথ্য এইখানে অকৃপণ; এই সভার সভ্যদের কাছে আমার পরিচয় অত্যন্ত ঔদাসীন্যের দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না।

দেশবিদেশে আমার সম্মানের বিবরণ আমার বন্ধু এইমাত্র বর্ণনা করেছেন। বাইরের দিক থেকে বিদেশের কাছে আমার পরিচয় পরিমাণ-হিসাবে অতি অল্প। আমার লেখার সামান্য এক অংশের তর্জমা তাঁদের কাছে পৌঁচেছে, সে তর্জমারও অনেকখানি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। কিন্তু সাহিত্যে, কলারচনায়, পরিমাণের হিসাবটা বড়ো হিসাব নয়, সে ক্ষেত্রে অল্প হয়তো বেশির চেয়ে বেশি হতেও পারে। সাহিত্যকে ঠিকভাবে যে দেখে সে মেপে দেখে না, তলিয়ে দেখে; লম্বা পাড়ি দিয়ে সাঁতার না কাটলেও তার চলে, সে ডুব দিয়ে পরিচয় পায়, সেই পরিচয় অন্তরতর। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক তথ্যের জন্যে পরিমাণের দরকার, স্বাদের বিচারের জন্যে এক গ্রাসের মূল্য দুই গ্রাসের চেয়ে কম নয়। বস্তুত এই ক্ষেত্রে অধিক অনেক সময়ে স্বল্পের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়; অনেককে দেখতে গিয়ে যে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে তাতে এককে দেখবার বাধা ঘটায়। রসসাহিত্যে এই এককে দেখাই আসল দেখা।

একজন য়ুরোপীয় আর্টিস্টকে একদিন বলেছিলুম যে, ইচ্ছা করে ছবি আঁকার চর্চা করি, কিন্তু আমার ক্ষীণ দৃষ্টি বলে চেষ্টা করতে সাহস হয় না। তিনি বললেন, “ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছা ক’রেই কিছু নামিয়ে দিতে হয়। ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম।’

দেশের লোক কাছের লোক– তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আমার নানা মত আছে, নানা কর্ম আছে, সংসারে নানা লোকের সঙ্গে আমার নানা সম্বন্ধ আছে; কাছের মানুষের কোনো দাবি আমি রক্ষা করি, কোনো দাবি আমি রক্ষা করতে অক্ষম; কেউ বা আমার কাছ থেকে তাঁদের কাজের ভাবের চিন্তার সম্মতি বা সমর্থন পান কেউ বা পান না, এই-সমস্তকে জড়িয়ে আমার পরিচয় তাঁদের কাছে নানাখানা হয়ে ওঠে– নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অনভিরুচি ও রাগদ্বেষের ধুলিনিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে-দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে

দৃষ্টিবিষয়ের সত্যতা স্পষ্ট করে তোলে, দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্তকালের আকাশের মধ্যে সঞ্চরণশীল যে-সত্যকে দেখা আবশ্যক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আলপিন দিয়ে রুদ্ধ ক'রে ধরে; তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না। এইরকম দেশের লোকের অতি নিকট দৃষ্টির কাছে নিজের যে খর্বতা তা আমি অনেককাল থেকে অনুভব করে এসেছি। দেশের লোকের সভায় এরই সংকোচ আমি এড়াতে পারি নে। অন্যত্র জগদ্‌বরেণ্য লোকদের সামনে আমাকে কথা বলতে হয়েছে, কিছুমাত্র দ্বিধা আমার মনে কোনোদিন আসে নি; নিশ্চয় জেনেছি, তাঁরা আমাকে স্পষ্ট ক'রে বুঝবেন, একটি নির্মল ও প্রশস্ত ভূমিকার মধ্যে আমার কথাগুলিকে তাঁরা ধ'রে দেখতে পারবেন। এ দেশে, এমন-কি, অল্পবয়স্ক ছাত্রদের সামনেও দাঁড়াতে আমার সংকোচ বোধ হয়- জানি যে, কত কী ঘরাও কারণে ও ঘর-গড়া অসত্যের ভিতর দিয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের আদর্শ উদার হওয়া সম্ভবপর হয় না।

এইজন্যেই যমরাজের নিন্দার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি; কারণ, তাঁর উপরে আমার মস্ত ভরসা। তিনি নৈকট্যের অন্তরাল ঘুচিয়ে দেবেন; আমার মধ্যে যা-কিছু অবান্তর নিরর্থক ক্ষণকালীন, আর আমার সম্বন্ধে যা-কিছু মিথ্যা সৃষ্টি, সে-সমস্তই তিনি এক অন্তিম নিশ্বাসে উড়িয়ে দেবেন। বাহিরের নৈকট্যকে সরিয়ে ফেলে অন্তরের নৈকট্যকে তিনি সুগম করবেন। কবিরাজদের পরম সুহৃদ যমরাজ। যেদিন তিনি আমাকে তাঁর দরবারে ডেকে নেবেন সেদিন তোমাদের এই রবীন্দ্র-পরিষদ খুব জমে উঠবে।

কিন্তু, এ কথা ব'লে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা নেই। মানুষ মানুষের নগদ প্রীতি চায়। মৃত্যুর পরে স্মরণসভার সভাপতির গদ্‌গদ্ ভাষার করুণ রস যেখানে উচ্ছ্বসিত, সেখানে তৃষার্তের পাত্র পৌঁছয় না। যে জীবলোকে এসেছি এখানে নানা রসের উৎস আছে, সেই সুধারসে মর্তলোকেই আমরা অমৃতের স্বাদ পাই; বুঝতে পারি, এই মাটির পৃথিবীতেও অমরাবতী আছে। মানুষের কাছে মানুষের প্রীতি তারই মধ্যে একটি প্রধান অমৃতরস- মরবার পূর্বে এ যদি অঞ্জলি ভরে পান করতে পাই তা হলে মৃত্যু অপ্রমাণ হয়ে যায়।

অনেক দিনের কথা বলছি, তখন আমার অল্প বয়স। একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুশয্যার পাশে আমি বসে আছি। তিনি বললেন, “রবি, তোমার হাতটা আমাকে দাও দেখি।’ হাত বাড়িয়ে দিলেম, কিন্তু তাঁর এই অনুরোধের ঠিক মানেটি বুঝতে পারলেম না। অবশেষে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, “আমি এই যে জীবলোক থেকে বিদায় নিচ্ছি, তোমার হাতের স্পর্শে তারই শেষস্পর্শ নিয়ে যেতে চাই।’

সেই জীবলোকের স্পর্শের জন্যে মনে আকাঙক্ষা থাকে। কেননা, চলে যেতে হবে। আমার কাছে সেই স্পর্শটি কোথায় স্পষ্ট, কোথায় নিবিড়। যেখান থেকে এই কথাটি আসছে, “তুমি আমাকে খুশি করেছ, তুমি যে জন্মেছ সেটা আমার কাছে সার্থক, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার মূল্য আমি মানি।’ বর্তমানের এই বাণীর মধ্যে ভাবীকালের দানও প্রচ্ছন্ন; যে-প্রীতি, যে শ্রদ্ধা সত্য ও গভীর, সকল কালের সীমা সে অতিক্রম করে; ক্ষণকালের মধ্যে সে চিরকালের সম্পদ দেয়। আমার বিদায়কাল অধিক দূরে নেই; এই সময়ে জীবলোকের আনন্দস্পর্শ তোমাদের এই পরিষদে আমার জন্য তোমরা প্রস্তুত রেখেছ, তোমাদের যা দেয় ভাবীকালের উপরে তার বরাত দাও নি।

ভাবীকালকে অত্যন্ত বেশি করে জুড়ে বসে থাকব, এমন আশাও নেই, আকাঙক্ষাও নেই। ভবিষ্যতের কবি ভবিষ্যতের আসন সগৌরবে গ্রহণ করবে। আমাদের কাজ তাদেরই স্থান প্রশস্ত করে দেওয়া। মেয়াদ ফুরোলে যে-গাছ মরে যায় অনেক দিন থেকে ঝরা পাতায় সে মাটি তৈরি করে; সেই মাটিতে খাদ্য জমে থাকে পরবর্তী গাছের জন্যে। ভবিষ্যতের সাহিত্যে আমার জন্যে যদি জায়গার টানাটানিও হয় তবু এ কথা সবাইকে মানতে হবে যে, সাহিত্যের মাটির মধ্যে গোচরে অগোচরে প্রাণের বস্তু কিছু রেখে গেছি। নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরাতনের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে প্রাণশক্তি পায় না; আমাদের বাণীর সপ্তকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবেই ভবিষ্যতের বাণী উপরের সপ্তকে চড়তে পারে। সে সপ্তকে রাগিণী তখন নূতন হবে, কিন্তু পুরাতনকে অশ্রদ্ধা করবার স্পর্ধা যেন তার না হয়। মনে যেন থাকে, তখনকার কালের পুরাতন এখনকার কালে নূতনের গৌরবেই আবির্ভূত হয়েছিল।

নবযুগ একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়- তার বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। মহারাজাবাহাদুর আকাশে যে জয়ধ্বজা ওড়ান আজ সে নতুন, কাল সে পুরনো। কিন্তু সূর্যের রথে যে অরুণধ্বজা ওড়ে কোটি কোটি যুগ ধরে প্রতিদিনই সে নবীন। একটি বালিকা তার স্বাক্ষরখাতায় আমার কাছ থেকে একটি বাংলা শ্লোক চেয়েছিল। আমি লিখে দিয়েছিলুম –

নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান সেই তো নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
নবীনের নিত্যসুধা তৃপ্তি করে পুরা।

সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো-একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন “খুন’। পুরাতন “রক্ত’ শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

সাহিত্যে এইরকম নতুন হয়ে উঠবার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণবর্ণে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে “খুন’ ফরমাস করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক। আর যে-বৃদ্ধদের মর্‌চে-ধরা চিত্তবীণায় পুরাতনের স্পর্শে নবীন

রাগিণী বেজে ওঠে না তাঁদের সঙ্গে আমার মিল হবে না, তাঁদের বয়স নিতান্ত কাঁচা হলেও।

এই পরিষদ সকল বয়সের সেই তরুণদের পরিষদ হোক। পুরাতনের নবীনতা বুঝতে তাঁদের যেন কোনো বাধা না থাকে।

১: প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ্

২: সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

১৩৩৪

পঞ্চাশোর্ধ্বম্

পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে সরে থাকার জন্য মনু আদেশ করেছেন।

যাকে তিনি পঞ্চাশ বলেছেন, সে একটা গণিতের অঙ্ক নয়, তার সম্বন্ধে ঠিক ঘড়িধরা হিসাব চলে না। ভাবখানা এই যে, নিরন্তরপরিণতি জীবনের ধর্ম নয়। শক্তির পরিব্যাপ্তি কিছুদিন পর্যন্ত এগিয়ে চলে, তার পরে পিছিয়ে আসে। সেই সময়টাতেই কর্মে যতি দেবার সময়; না যদি মানা যায়, তবে জীবনযাত্রার ছন্দোভঙ্গ হয়।

জীবনের ফসল সংসারকে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেমন-তেমন করে দিলেই হল না। শাস্ত্র বলে, “শ্রদ্ধয়া দেয়ম্’; যা আমাদের শ্রেষ্ঠ তাই দেওয়াই শ্রদ্ধার দান– সে না কুঁড়ির দান, না ঝরা ফুলের। ভরা ইন্দারায় নির্মল জলের দাক্ষিণ্য, সেই পূর্ণতার সুযোগেই জলদানের পূণ্য; দৈন্য যখন এসে তাকে তলার দিকে নিয়ে যায়, তখন যতই টানাটানি করি ততই ঘোলা হয়ে ওঠে। তখন এ কথা যেন প্রসন্ন মনে বলতে পারি যে, থাক্, আর কাজ নেই।

বর্তমান কালে আমরা বড়ো বেশি লোকচক্ষুর গোচরে। আর পঞ্চাশ বছর পূর্বেও এত বেশি দৃষ্টির ভিড় ছিল না। তখন আপন মনে কাজ করার অবকাশ ছিল, অর্থাৎ কাজ না-করাটাও আপন মনের উপরই নির্ভর করত, হাজার লোকের কাছে তার জবাবদিহি ছিল না। মনু যে “বনং ব্রজেৎ’ বলেন, সেই ছুটি নেবার বনটা হাতের কাছেই ছিল; আজ সেটা আগাগোড়া নির্মূল। আজ মন যখন বলে “আর কাজ নেই’, বহু দৃষ্টির অনুশাসন দরজা আগলে বলে “কাজ আছে বৈকি’– পালাবার পথ থাকে না। জনসভায় ঠাসা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়া গেছে; পাশ কাটিয়ে চুপিচুপি সরে পড়বার জো নেই। ঘরজোড়া বহু চক্ষুর ভর্ৎসনা এড়াবে, কার সাধ্য? চারি দিক থেকে রব ওঠে, “যাও কোথায় এরই মধ্যে?’ ভগবান মনুর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায়।

যে কাজটা নিজের অন্তরের ফরমাশে তা নিয়ে বাহিরের কাছে কোনো দায় নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে বাহিরের দাবি দুর্বার। যে-মাছ জলে আছে তার কোনো বালাই নেই, যে-মাছ হাটে এসেছে তাকে নিয়েই মেছোবাজার। সত্য করেই হোক, ছল করেই হোক, রাগের ঝাঁজে হোক, অনুরাগের ব্যথায় হোক, যোগ্য ব্যক্তিই হোক, অযোগ্য ব্যক্তিই হোক, যে-সে যখন-তখন যাকে-তাকে বলে উঠতে পারে, “তোমার রসের জোগান কমে আসছে, তোমার রূপের ডালিতে রঙের রেশ ফিকে হয়ে এল।’ তর্ক করতে যাওয়া বৃথা; কারণ শেষ যুক্তিটা এই যে, “আমার পছন্দমাফিক হচ্ছে না।’ “তোমার পছন্দের বিকার হতে পারে, তোমার সুরুচির অভাব থাকতে পারে’ এ কথা বলে লাভ নেই। কেননা, এ হল রুচির বিরুদ্ধে রুচির তর্ক; এ তর্কে দেশকালপাত্রবিশেষে কটুভাষার পঙ্কিলতা মথিত হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় শাস্তির কটুত্ব কমাবার জন্যে সবিনয় দীনতা স্বীকার করে বলা ভালো যে, স্বভাবের নিয়মেই শক্তির হ্রাস; অতএব শক্তির পূর্ণতাকালে যে-উপহার দেওয়া গেছে তারই কথা মনে রেখে, অনিবার্য অভাবের সময়কার ত্রুটি ক্ষমা করাই সৌজন্যের লক্ষণ। শ্রাবণের মেঘ আশ্বিনের আকাশে বিদায় নেবার বেলায় ধারাবর্ষণে যদি ক্লান্তি প্রকাশ করে তবে জনপদবধূরা তাই নিয়ে কি তাকে দুয়ো দেয়। আপন নবশ্যামল ধানের খেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে কি করে না আষাঢ়ে এই মেঘেরই প্রথম সমাগমের দাক্ষিণ্যসমারোহের কথা।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই সৌজন্যের দাবি প্রায় ব্যর্থ হয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রেও পূর্বকৃতকর্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভদ্ররীতি আছে। পেন্‌শনের প্রথা তার প্রমাণ। কিন্তু, সাহিত্যেই পূর্বের কথা স্মরণ ক’রে শক্তির হ্রাস ঘটাকে অনেকেই ক্ষমা করতে চায় না। এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে অনেকেই এতে উল্লাস অনুভব করে। কষ্টকল্পনার জোরে হালের কাজের ত্রুটি প্রমাণ ক’রে সাবেক কাজের মূল্যকে খর্ব করবার জন্যে তাদের উত্তপ্ত আগ্রহ। শোনা যায়, কোনো কোনো দেশে এমন মানুষ আছে যারা তাদের সমাজের প্রবীণ লোকের শক্তির কৃশতা অনুমান করলে তাকে বিনা বিলম্বে চালের উপর থেকে নীচে গড়িয়ে মারে। মানুষকে উচ্চ চালের থেকে নীচে ভূমিসাৎ করবার ছুতো

খুঁজে বেড়ানো, কেবল আফ্রিকায় নয়, আমাদের সাহিত্যেও প্রচলিত। এমনতরো সংকটসংকুল অবস্থায় জনসভার প্রধান আসন থেকে নিস্কৃতি লওয়া সংগত; কেননা, এই প্রধান আসনগুলোই চালের উপরিতল, হিংস্রতা-উদ্‌বোধন করবার জায়গা।

আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কেবলমাত্র সাহিত্যের কৃতিত্বকে কোনো মানুষের পক্ষেই চরম লক্ষ্য বলে মানতে চায় না। একদা তাকে অতিক্রম করবার সাধনাও মনে রাখতে হবে। জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্মের জন্যে প্রস্তুত হতে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তার পরে পঁচিশ বছর পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবার সময়। অবশেষে ক্রমে ক্রমে সেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্যে আরো পঁচিশ বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবি মাঝখানটাতে; আরম্ভেও নয়, শেষেও নয়।

এই ছিল আমাদের দেশের বিধান। কিন্তু পশ্চিমের নীতিতে কর্তব্যটাই শেষ লক্ষ্য, যে-মানুষ কর্তব্য করে সে নয়। আমাদের দেশে কর্মের যন্ত্রটাকে স্বীকার করা হয়েছে, কর্মীর আত্মাকেও। সংসারের জন্যে মানুষের কাজ করতে হবে, নিজের জন্যে মানুষকে মুক্তি পেতেও হবে।

কর্ম করতে করতে কর্মের অভ্যাস কঠিন হয়ে ওঠে এবং তার অভিমান। এক সময়ে কর্মের চলতি স্রোত আপন বালির বাঁধ আপনি বাঁধে, আর সেই বন্ধনের অহংকারে মনে করে সেই সীমাই চরম সীমা, তার ঊর্ধ্বে আর গতি নেই। এমনি করে ধর্মতন্ত্র যেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর পাকা করে আপন সীমা নিয়েই গর্বিত হয়, তেমনি সকলপ্রকার কর্মই একটা সাম্প্রদায়িকতার ঠাট গড়ে তুলে সেই সীমাটার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা ও ঘোষণা করতে ভালোবাসে।

সংসারে যতকিছু বিরোধ এই সীমায় সীমায় বিরোধ, পরস্পরের বেড়ার ধারে এসে লাঠালাঠি। এইখানেই যত ঈর্ষা বিদ্বেষ ও চিত্তবিকার। এই কলুষ থেকে সংসারকে রক্ষা করবার উপায় কর্ম হতে বেরিয়ে পড়বার পথকে বাধামুক্ত রেখে দেওয়া। সাহিত্যে একটা

ভাগ আছে যেখানে আমরা নিজের অধিকারে কাজ করি, সেখানে বাহিরের সঙ্গে সংঘাত নেই। আর-একটা ভাগ আছে যেখানে সাহিত্যের পণ্য আমরা বাহিরের হাটে আনি, সেইখানেই হট্টগোল। একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এমন দিন আসে যখন এইখানে গতিবিধি যথাসম্ভব কমিয়ে আনাই ভালো; নইলে বাইরে ওড়ে ধুলোর ঝড়, নিজের ঘটে অশান্তি, নইলে জোয়ান লোকদের কনুয়ের ঠেলা গায়ে প'ড়ে পাঁজরের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

সাহিত্যলোকে বাল্যকাল থেকেই কাজে লেগেছি। আরম্ভে খ্যাতির চেহারা অনেককাল দেখি নি। তখনকার দিনে খ্যাতির পরিসর ছিল অল্প; এইজন্যই বোধ করি, প্রতিযোগিতার পরুষতা তেমন উগ্র ছিল না। আত্মীয়মহলে যে-কয়জন কবির লেখা সুপরিচিত ছিল, তাঁদের কোনোদিন লঙ্ঘন করব বা করতে পারব, এমন কথা মনেও করি নি। তখন এমন কিছু লিখি নি যার জোরে গৌরব করা চলে, অথচ এই শক্তিদৈন্যের অপরাধে ব্যক্তিগত বা কাব্যগত এমন কটুকাটব্য শুনতে হয় নি যাতে সংকোচের কারণ ঘটে।

সাহিত্যের সেই শিথিল শাসনের দিন থেকে আরম্ভ করে গদ্যে পদ্যে আমার লেখা এগিয়ে চলেছে, অবশেষে আজ সত্তর বছরের কাছে এসে পৌঁছলেম। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সমস্ত অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও তা করেছি। তবু যতই করি-না কেন আমার শক্তির একটা স্বাভাবিক সীমা আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারই বা নেই।

এই সীমাটি দুই উপকুলের সীমা। একটা আমার নিজের প্রকৃতিগত, আর-একটা আমার সময়ের প্রকৃতিগত। জেনে এবং না-জেনে আমরা এক দিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্য দিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে-পরিতৃপ্তি সাধন করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাব নিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে। সেখানে বৈতরণীর পারে চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে বসে আছেন। ভাষায় ছন্দে নূতন শক্তি এবং ভাবে

চিত্তের নূতন প্রসার সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করে। কী পরিমাণে তারই আয়োজন করা গেছে তার একটা জবাবদিহি আছে।

কখন কালের পরিবর্তন ঘটে, সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারি নি। নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল-ফল-ফসলের দাবি এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায় তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে; তখন কালের কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা করা চলে না, তখনই কালের আসন ত্যাগ করবার সময়।

যাকে বলছি কালের আসন সে চিরকালের আসন নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাঁইবদলের হুকুম যদি আসে, তবে সেটাকে মানতে হবে। প্রথমটা গোলমাল ঠেকে। নতুন অভ্যাগতের নতুন আকারপ্রকার দেখে তাকে অভ্যর্থনা করতে বাধা লাগে, সহসা বুঝতে পারি নে– সেও এসেছে বর্তমানের শিখর অধিকার করে চিরকালের আসন জয় করে নিতে। একদা সেখানে তারও স্বত্ব স্বীকৃত হবে, গোড়ায় তা মনে করা কঠিন হয় ব'লে এই সন্ধিক্ষণে একটা সংঘাত ঘটতেও পারে।

মানুষের ইতিহাসে কাল সব সময়ে নূতন ক'রে বাসা বদল করে না। যতক্ষণ দ্বারে একটা প্রবল বিপ্লবের ধাক্কা না লাগে ততক্ষণ সে খরচ বাঁচাবার চেষ্টায় থাকে, আপন পূর্বদিনের অনুবৃত্তি ক'রে চলে, দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিকেই মাল্যচন্দন দিয়ে পূজা করে, অলসভাবে মনে করে সেটা সনাতন। তখন সাহিত্য পুরাতন পথেই পণ্য বহন ক'রে চলে, পথনির্মাণের জন্য তার ভাবনা থাকে না। হঠাৎ একদিন পুরাতন বাসায় তার আর সংকুলান হয় না। অতীতের উত্তর দিক থেকে হাওয়া বওয়া বন্ধ হয়, ভবিষ্যতের দিক থেকে দক্ষিণ-হাওয়া চলতে শুরু করে। কিন্তু, বদলের হাওয়া বইল বলেই যে নিন্দার হাওয়া তুলতে হবে, তার কোনো কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব আছে, যে-অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বলবার উপলক্ষ খোঁজে তার মন সংকীর্ণ, তার স্বভাব রূঢ়। আকবরের সভায় যে দরবারি আসর জমেছিল, নবদ্বীপের কীর্তনে তাকে খাটানো গেল না। তাই ব'লে দরবারি তোড়িকে গ্রাম্যভাষায় গাল পাড়তে বসা বর্বরতা।

নূতন কালকে বিশেষ আসন ছেড়ে দিলেও দরবারি তোড়ির নিত্য আসন আপন মর্যাদায় অক্ষুণ্ন থাকে। গোঁড়া বৈষ্ণব তাকে তাচ্ছিল্য ক'রে যদি খাটো করতে চায় তবে নিজেকেই খাটো করে। বস্তুত নূতন আগন্তুককেই প্রমাণ করতে হবে, সে নূতন কালের জন্য নূতন অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছে কি না।

কিন্তু, নূতন কালের প্রয়োজনটি ঠিক যে কী সে তার নিজের মুখের আবেদন শুনে বিচার করা চলে না, কারণ, প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত। হয়তো কোনো আশু উত্তেজনা, বাইরের কোনো আকস্মিক মোহ, তার অন্তর্গূঢ় নীরব আবেদনের উলটো কথাই বলে; হয়তো হঠাৎ একটা আগাছার দুর্দমতা তার ফসলের খেতের প্রবল প্রতিবাদ করে; হয়তো একটা মুদ্রাদোষে তাকে পেয়ে বসে, সেইটেকেই সে মনে করে শোভন ও স্বাভাবিক। আত্মীয়সভায় সেটাতে হয়তো বাহবা মেলে, কিন্তু সর্বকালের সভায় সেটাতে তার অসম্মান ঘটে। কালের মান রক্ষা ক'রে চললেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এ কথা বলব না। এমন দেখা গেছে, যাঁরা কালের জন্য সত্য অর্ঘ্য এনে দেন তাঁরা সেই কালের হাত থেকে বিরুদ্ধ আঘাত পেয়েই সত্যকে সপ্রমাণ করেন।

আধুনিক যুগে, য়ুরোপের চিত্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয় আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে। ভিক্টোরিয়া-যুগ জুড়ে সেদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডে এই মেজাজ প্রায় সমভাবেই ছিল। এই দীর্ঘকালের অধিক সময় সেখানকার সমাজনীতি ও সাহিত্যরীতি একটানা পথে এমনভাবে চলেছিল যে মনে হয়েছিল যে, এ ছাড়া আর গতি নেই। উৎকর্ষের আদর্শ একই কেন্দ্রের চারি দিকে আবর্তিত হয়ে প্রাগ্রসর উদ্যমকে যেন নিরস্ত করে দিলে। এই কারণে কিছুকাল থেকে সেখানে সমাজে, সাহিত্যকলা সৃষ্টিতে, একটা অধৈর্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী চিত্ত সবকিছু উলট-পালট করবার জন্য কোমর বাঁধল, গানেতে ছবিতে দেখা দিল যুগান্তের তাণ্ডবলীলা। কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ায় একটা রব উঠল "আর ভালো লাগছে না'। যা-করে হোক আর কিছু-একটা ঘটা চাই। যেন সেখানকার ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব মনুর বিধান মানতে চায় নি, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল তবু ছুটি নিতে তার মন ছিল না। মহাকালের উন্মত্ত চরগুলো

একটি একটি করে তার অঙ্গনে ক্রমে জুটতে লাগল; ভাবখানা এই যে, উৎপাত করে ছুটি নেওয়াবেই। সেদিন তার আর্থিক জমার খাতায় ঐশ্বর্যের অঙ্কপাত নিরবচ্ছিন্ন বেড়ে চলছিল। এই সমৃদ্ধির সঙ্গে শান্তি চিরকালের জন্যে বাঁধা, এই ছিল তার বিশ্বাস। মোটা মোটা লোহার সিন্ধুকগুলোকে কোনো-কিছুতে নড়্‌চড়্‌ করতে পারবে, এ কথা সে ভাবতেই পারে নি। এইজন্য একঘেয়ে উৎকর্ষের বিরুদ্ধে অনিবার্য চাঞ্চল্যকে সেদিনের মানুষ ঐ লোহার সিন্ধুকের ভরসায় দমন করবার চেষ্টায় ছিল।

এমন সময় হাওয়ায় এ কী পাগলামি জাগল। একদিন অকালে হঠাৎ জেগে উঠে সবাই দেখে, লোহার সিন্ধুকে সিন্ধুকে ভয়ংকর মাথা-ঠোকাঠুকি; বহুদিনের সুরক্ষিত শান্তি ও পুঞ্জীভূত সম্বল ধুলোয় ধুলোয় ছড়াছড়ি; সম্পদের জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মুহূর্তে হল ভূমিসাৎ। পুষ্টদেহধারী তুষ্টচিত্ত পুরাতনের মর্যাদা আর রইল না। নূতন যুগ আলুথালু বেশে অত্যন্ত হঠাৎ এসে পড়ল, তাড়াহুড়ো বেধে গেল, গোলমাল চলছে–সাবেক-কালের কর্তাব্যক্তির ধমকানি আর কানে পৌঁছায় না।

অস্থায়িত্বের এই ভয়ংকর চেহারা অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কোনো-কিছুর স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা লোকের একেবারে আলগা হয়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যে কলারচনার অবাধে নানাপ্রকারের অনাসৃষ্টি শুরু হল। কেউ বা ভয় পায়, কেউ বা উৎসাহ দেয়, কেউ বলে “ভালো মানুষের মতো থামো’, কেউ বলে “মরিয়া হয়ে চলো’। এই যুগান্তরের ভাঙচুরের দিনে যাঁরা নূতন কালের নিগূঢ় সত্যটিকে দেখতে পেয়েছেন ও প্রকাশ করছেন তাঁরা যে কোথায়, তা এই গোলমালের দিনে কে নিশ্চিত করে বলতে পারে। কিন্তু, এ কথা-ঠিক যে, যে-যুগ পঞ্চাশ পেরিয়েও তক্ত আঁকড়ে গদিয়ান হয়ে বসে ছিল, নূতনের তাড়া খেয়ে লোটাকম্বল হাতে বনের দিকে সে দৌড় দিয়েছে। সে ভালো কি এ ভালো সে তর্ক তুলে ফল নেই; আপাতত এই কালের শক্তিকে সার্থক করবার উপলক্ষে নানা লোকে নব নব প্রণালীর প্রবর্তন করতে বসল। সাবেক প্রণালীর সঙ্গে মিল হচ্ছে না ব’লে যারা উদ্‌বেগ প্রকাশ করছে তারাও ঐ পঞ্চাশোর্ধ্বের দল, বনের পথ ছাড়া তাদের গতি নেই।

তাই বলছিলেম, ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন পঞ্চাশোর্ধম্‌ আছে, কালগত হিসাবেও তেমনি। সময়ের সীমাকে যদি অতিক্রম করে থাকি তবে সাহিত্যে অসহিষ্ণুতা মথিত হয়ে উঠবে। নবাগত যাঁরা তাঁরা যে-পর্যন্ত নবযুগে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে নিজেরা প্রতিষ্ঠালাভ না করবেন সে-পর্যন্ত শান্তিহীন সাহিত্য কলুষলিপ্ত হবে। পুরাতনকে অতিক্রম করে নূতনকে অভূতপূর্ব করে তুলবই, এই পণ করে বসে নবসাহিত্যিক যতক্ষণ নিজের মনটাকে ও লেখনীটাকে নিয়ে অত্যন্ত বেশি টানাটাটি করতে থাকবেন, ততক্ষণ সেই অতিমাত্র উদ্‌বেজনায় ও আলোড়নে সৃষ্টিকার্য অসম্ভব হয়ে উঠবে।

যেটাকে মানুষ পেয়েছে, সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয়; যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানত তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। বাহিরের কর্মে যে-প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ করতে পারে নি, সাহিত্যে কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানা ভাবে দেখা দেয়। শাস্ত্র বলে, ইচ্ছাই সত্তার বীজ। ইচ্ছাকে মারলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। ইচ্ছার বিশেষত্ব অনুসরণ করে আত্মা বিশেষ দেহ ও গতি লাভ করে। বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের সেই সমাজের আত্মরূপসৃষ্টির বীজশক্তি। এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রিক লোকগুরু তাঁরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইচ্ছাকে সর্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে চেষ্টা করেন, নইলে মুক্তির সাধনা দেশে সত্যরূপ গ্রহণ করে না।

সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায় যাতে সে মনোহর হয়ে ওঠে, এমন পরিস্ফূট মূর্তি ধরে যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যয়গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গিতে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে কাজ করতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে। রামায়ণ মহাভারত ভারতবাসী হিন্দুকে বহুযুগ থেকে মানুষ করে এসেছে। একদা ভারতবর্ষ যে-আদর্শ কামনা করেছে তা ঐ দুই কাব্যে চিরজীবী হয়ে গেল। এই কামনাই সৃষ্টিশক্তি। বঙ্গদর্শনে এবং বঙ্কিমের রচনায়

বাংলাসাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলাদেশের মেয়েপুরুষের মনকে এক কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে; এদের ব্যবহারে ভাষায় রুচিতে পূর্বকালবর্তী ভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। যা আমাদের ভালো লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলায় আমাদের সেই ভালো-লাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজসৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কারণেই সাহিত্যে যাতে ভদ্রসমাজের আদর্শ বিকৃত না হয়, সকল কালেরই এই দায়িত্ব।

বঙ্কিম যে-যুগ প্রবর্তন করেছেন আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার সৃষ্টির উপকরণ জোগানো এ-পর্যন্ত আমার কাজ ছিল। য়ুরোপের যুগান্তর-ঘোষণার প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ বলছেন, আমাদের সেই যুগেরও অবসান হয়েছে। কথাটা খাঁটি না হতেও পারে। যুগান্তরের আরম্ভে প্রদোষান্ধকারে তাকে নিশ্চিত করে চিনতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু, সংবাদটা যদি সত্যই হয় তবে এই যুগসন্ধ্যার যাঁরা অগ্রদূত তাঁদের ঘোষণাবাণীতে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি ও প্রত্যুষের সুনির্মল শান্তি আসুক; নবযুগের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করুক, বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা নয়। রাত্রির চন্দ্রকে যখন বিদায় করবার সময় আসে তখন কুয়াশার কলুষ দিয়ে তাকে অপমানিত করবার প্রয়োজন হয় না, নবপ্রভাতের সহজ মহিমার শক্তিতেই তার অন্তর্ধান ঘটে।

পথে চলতে চলতে মর্তলীলার প্রান্তবর্তী ক্লান্ত পথিকের এই নিবেদনপত্র সসংকোচে "তরুণসভায়' প্রেরণ করলেম। এই কালের যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কৃতার্থতা একান্তমনে কামনা করি। নবজীবনের অমৃতপাত্র যদি সত্যই তাঁরা পূর্ণ ক'রে এনে থাকেন, আমাদের কালের ভাণ্ড আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রিক্ত হয়েই থাকে, আমাদের দিনের ছন্দ যদি এখনকার দিনের সঙ্গে নাই মেলে, তবে তার যাথার্থ্য নূতন কাল সহজেই প্রমাণ করবেন– কোনো হিংস্রনীতির প্রয়োজন হবে না। নিজের আয়ুর্দৈর্ঘ্যের অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই; তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সমাপ্তির জন্য বিলুপ্তি অনাবশ্যক। সাহিত্যে পঞ্চাশোর্ধ্বম্‌

নিজের তিরোধানের বন নিজেই সৃষ্টি করে, তাকে কর্কশকণ্ঠে তাড়না ক'রে বনে পাঠাতে হয় না।

অবশেষে যাবার সময় বেদমন্ত্রে এই প্রার্থনাই করি– যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব : যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ করো।

১৩৩৬

বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ

একদিন কলিকাতা ছিল অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী; সেখানে বসল বিদেশী বাণিজ্যের হাট, গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরিয়ে দিয়ে শহরের উদ্ধত রূপ প্রকাশ পেতে লাগল। সেই শহর আধুনিক কালকে দিল আসন পেতে; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের পথে দিগন্তের পর দিগন্তে সেই আসন বিস্তৃত হয়ে চলল।

এই উপলক্ষে বর্তমান যুগের বেগমান চিত্তের সংস্রব ঘটল বাংলাদেশে। বর্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় বদ্ধ বা ব্যক্তিগত মূঢ় কল্পনায় জড়িত নয়। কি বিজ্ঞানে কি সাহিত্যে, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তার ভূমিকা। ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।

এক দিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র-বিস্তারে পাশ্চাত্যমানুষ এবং তার অনুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অন্য দিকে পূর্বপশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিক কালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্যসংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। বৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিরোধ করতে পারি নি, কিন্তু পাশ্চাত্যসংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা – নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য-উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুখ, কোনো দুর্নম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে– সকলপ্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস । এই সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে বিশ্ব ও মানব-লোকের সকল বিভাগভুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সকল কিছুই পরীক্ষা করেছে, বিশ্লেষণ সংঘটন বর্ণন করেছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম স্থূল যতকিছু

রহস্যকে অবারিত করছে। তার অন্তহীন জিজ্ঞাসাবৃত্তি প্রয়োজন অপ্রয়োজনে নির্বিচার, তার রচনা তুচ্ছ মহৎ সকল ক্ষেত্রেই উপাদানসংগ্রহে নিপুণ। এই বিরাট সাধনা আপন বেগবান প্রশস্ত গতির দ্বারাই আপন ভাষা ও ভঙ্গিকে যথাযথ, অত্যুক্তিবিহীন, এবং কৃত্রিমতার-জঞ্জাল-বিমুক্ত করে তোলে।

এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে। সজল মেঘ নীলনদীর তট থেকেই আসুক আর পূর্বসমুদ্রের বক্ষ থেকেই বাহিত হোক, তার বর্ষণে মুহূর্তেই অন্তর থেকে সাড়া দেয় উর্বরা ভূমি– মরুক্ষেত্র তাকে অস্বীকার করার দ্বারা যে অহংকার করে সেই অহংকারের নিষ্ফলতা শোচনীয়। মানুষের চিত্তসম্ভূত যা-কিছু গ্রহণীয় তাকে সম্মুখে আসবামাত্র চিনতে পারা ও অভ্যর্থনা করতে পারার উদারশক্তিকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। চিত্তসম্পদকে সংগ্রহ করার অক্ষমতাই বর্বরতা, সেই অক্ষমতাকেই মানসিক আভিজাত্য বলে যে-মানুষ কল্পনা করে সে কৃপাপাত্র।

প্রথম আরম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালি যুবক গ্রহণ করেছে। সেটা ধার-করা সাজসজ্জার মতোই তাকে অস্থির করে রাখলে, বাইরে থেকে পাওয়া জিনিসের অহংকার নিয়ত উদ্যত হয়ে রইল। ইংরেজিসাহিত্যের ঐশ্বর্যভোগের অধিকার তখন ছিল দুর্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তগম্য, সেই কারণেই এই সংকীর্ণশ্রেণীগত ইংরেজি-পোড়োর দল নূতনলব্ধ শিক্ষাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করতেন।

কথায়-বার্তায় পত্রব্যবহারে সাহিত্যরচনায় ইংরেজিভাষার বাইরে পা বাড়ানো তখনকার শিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলিন্যের লক্ষণ। বাংলাভাষা তখন সংস্কৃত-পণ্ডিত ও বাংলা-পণ্ডিত দুই দলের কাছেই ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। এ ভাষার দারিদ্র্যে তাঁরা লজ্জাবোধ করতেন। এই ভাষাকে তাঁরা এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর মতো মনে করতেন যার

হাঁটুজলে পাড়াগেঁয়ে মানুষের প্রতিদিনের সামান্য ঘোরো কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশবিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না।

তবু এ কথা মানতে হবে, এই অহংকারের মূলে ছিল পশ্চিম-মহাদেশ হতে আহরিত নূতন-সাহিত্যরস-সম্ভোগের সহজ শক্তি। সেটা বিস্ময়ের বিষয়, কেননা, তাঁদের পূর্বতন সংস্কারের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল। অনেককাল মনের জমি ঠিকমত চাষের অভাবে ভরা ছিল আগাছায়, কিন্তু তার অন্তরে অন্তরে সফলতার শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন; তাই কৃষির সূচনা হবামাত্রই সাড়া দিতে সে দেরি করলে না। পূর্বকালের থেকে তার বর্তমান অবস্থার যে-প্রভেদ দেখা গেল তা দ্রুত এবং বৃহৎ। তার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ দেখি রামমোহন রায়ের মধ্যে। সেদিন তিনি যে বাংলাভাষায় ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন সে-ভাষার পূর্ব-পরিচয় এমন কিছুই ছিল না যাতে করে তার উপরে এত বড়ো দুরূহ ভার অর্পণ সহজে সম্ভবপর মনে হতে পারত। বাংলাভাষায় তখন সাহিত্যিক গদ্য সবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে নদীর তটে সদ্যশায়িত পলিমাটির স্তরের মতো। এই অপরিণত গদ্যেই দুর্বোধ তত্ত্বালোচনার ভারবহ ভিত্তি সংঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না।

এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য হোমর-মিল্‌টন-রচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তার ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেন নি। আষাঢ়ের আকাশে সজলনীল মেঘপুঞ্জ থেকে গর্জন নামল, গিরিগুহা থেকে তার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠল মাত্র, কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলে সাড়া দিলে আপন কেকাধ্বনিতেই। মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে-যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর সুরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপন-গড়া। কিন্তু, তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হল

আধুনিক কাব্য “রাজবদুন্নতধ্বনি’– কিন্তু, তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলাদেশে অধিক সময় তো লাগে নি। অথচ এর অনতিপূর্বকালবর্তী সাহিত্যের যে-নমুনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর কি সুদূর তুলনাও চলে।

আমি জানি, এখনো আমাদের দেশে এমন মানুষ পাওয়া যায় যারা সেই পুরাতনকালের অনুপ্রাসকন্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ ন্যাশনাল সাহিত্য আখ্যা দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করে থাকেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ স্থলেই সেটা একটা ভান মাত্র। তাঁরা যে স্বয়ং যথার্থত সেই সাহিত্যেরই রসসম্ভোগে একান্ত নিবিষ্ট থাকেন, রচনায় বা আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভূমিনির্মাণের কোনো এক আদিপর্বে হিমালয়পর্বতশ্রেণী স্থিতিলাভ করেছিল, আজ পর্যন্ত সে আর বিচলিত হয় নি; পর্বতের পক্ষেই এটা সম্ভবপর। মানুষের চিত্ত তো স্থাণু নয়; অন্তরে বাহিরে চার দিক থেকেই নানা প্রভাব তার উপর নিয়ত কাজ করছে, তার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে নিরন্তর; সে যদি জড়বৎ অসার না হয় তা হলে তার আত্মপ্রকাশে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটবেই, ন্যাশনাল আদর্শ নাম দিয়ে কোনো-একটি সুদূর ভূতকালবর্তী আদর্শবন্ধনে নিজেকে নিশ্চল করে রাখা তার পক্ষে স্বাভাবিক হতেই পারে না, যেমন স্বাভাবিক নয় চীনে মেয়েদের পায়ের বন্ধন। সেই বন্ধনকে ন্যাশনাল নামের ছাপ দিয়ে গর্ব করা বিড়ম্বনা। সাহিত্যে বাঙালির মন অনেক কালের আচারসংকীর্ণতা থেকে অবিলম্বে মুক্তি যে পেয়েছিল, তাতে তার চিৎশক্তির অসামান্যতাই প্রমাণ করেছে।

নবযুগের প্রাণবান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিককালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলে না। আপন শক্তির ‘পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলা ভাষার ‘পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন; বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্যে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে

মধুসূদন নিঃসঙ্কোচে যেসব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নূতন, বাংলা পয়ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে বন্যা বইয়ে দিলেন সেও নূতন, আর মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য-রচনায় যে-রীতি অবলম্বন করলেন তাও বাংলাভাষায় নূতন। এটা ক্রমে ক্রমে পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে সাবধানে ঘটল না; শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে– প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে।

মাইকেল সাহিত্যে যে যুগান্তর আনলেন তার অনতিকাল পরেই আমার জন্ম। আমার যখন বয়স অল্প তখন দেখেছি, কত যুবক ইংরেজি সাহিত্যের সৌন্দর্যে ভাববিহ্বল। শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন, বায়রণ, মেক্‌লে, বার্ক্‌ তাঁরা প্রবল উত্তেজনায় আবৃত্তি করে যেতেন পাতার পর পাতা। অথচ তাঁদের সমকালেই বাংলা সাহিত্যে যে নূতন প্রাণের উদ্যম সদ্য জেগে উঠেছে, সে তাঁরা লক্ষই করেন নি। সেটা যে অবধানের যোগ্য তাও তাঁরা মনে করতেন না। সাহিত্যে তখন যেন ভোরের বেলা কারো ঘুম ভেঙেছে, অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি। আকাশে অরুণালোকের স্বাক্ষরে তখনো ঘোষিত হয় নি প্রভাতের জ্যোতির্ময়ী প্রত্যাশা।

বঙ্কিমের লেখনী তার কিছু পূর্বেই সাহিত্যের অভিযানে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তখন অন্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই। যাঁরা তার রস পেয়েছেন তাঁরা তখনকার কালে নবীনা হলেও প্রাচীনকালীন সংস্কারের বাহিরে তাঁদের গতি ছিল অনভ্যস্ত। আর কিছু না হোক, ইংরেজি তাঁরা পড়েন নি। একথা মানতেই হবে, বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন। তাঁর ভাষা পূর্ববর্তী প্রকৃত বাংলা ও সংস্কৃত বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন। তাঁর রচনার আদর্শ কি বিষয়ে কি ভাবে কি ভঙ্গিতে পাশ্চাত্যের আদর্শের অনুগত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেকালে ইংরেজি ভাষায় বিদ্যান বলে যাদের অভিমান তাঁরা তখনও তাঁর লেখার যথেষ্ট সমাদর করেন নি; অথচ সে-লেখা ইংরেজি শিক্ষা-হীন তরুণীদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে বাধা পায় নি, এ আমরা দেখেছি। তাই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাবকে আর তো

ঠেকানো গেলো না। এই নব্য রচনারীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালি মন মানসিক চিরাভ্যাসের অপ্রশস্ত বেষ্টনকে অতিক্রম করতে পারলে- যেন অসূর্যস্পর্শরূপা অন্তঃপুরচারিণী আপন প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গনের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। এই মুক্তি সনাতন রীতির অনুকূল না হতে পারে কিন্তু সে যে চিরন্তন মানব প্রকৃতির অনুকূল, দেখতে দেখতে তার প্রমাণ পড়ল ছড়িয়ে।

এমন সময়ে বঙ্গদর্শন মাসিক পত্র দেখা দিল। তখন থেকে বাঙালীর চিত্তে নব্য বাংলা সাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল সর্বত্র। ইংরেজি-ভাষায় যাঁরা প্রবীণ তাঁরাও একে সবিস্ময়ে স্বীকার করে নিলেন। নব্যসাহিত্যের হাওয়ায় তখনকার তরুণী পাঠিকাদের মনঃপ্রকৃতির যে পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয়েছিল, সে কথা নিঃসন্দেহ। তরুণীরা সবাই রোমান্টিক হয়ে উঠছে, এইটেই তখনকার দিনের ব্যঙ্গ-রসিকদের প্রহসনের বিষয় হয়ে উঠল। কথাটা সত্য। ক্লাসিকের অর্থাৎ চিরাগত রীতির বাইরেই রোমান্টিকের লীলা। রোমান্টিকে মুক্তক্ষেত্রে হৃদয়ের বিহার। সেখানে অনভ্যস্ত পথে ভাবাবেগের আতিশয্য ঘটতে পারে। তাতে করে পূর্ববর্তী বাঁধা নিয়মানুবর্তনের তুলনায় বিপজ্জনক, এমন-কি, হাস্যজনক হয়ে উঠবার আশঙ্কা থাকে। দাঁড় থেকে ছাড়া পাওয়া কল্পনার পায়ে শিকল বাঁধা না থাকাতে ক্ষণে ক্ষণে হয়তো সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোভনতায়। কিন্ত, বড়ো পরিপ্রেক্ষণিকায় ছড়িয়ে দেখলে দেখা যায়, অভিজ্ঞতার বিচিত্র শিক্ষার মুক্তি মোটের উপরে সকলপ্রকার স্খলনকে অতিকৃতিকে সংশোধন করে চলে।

যাই হোক, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিবেগ বাংলার ছেলেমেয়েকে কোন্ পথে নিয়ে চলেছে, এ সভায় তার আলোচনার উপলক্ষ নেই। এই সভাতেই বাংলাসাহিত্যের বিশেষ সফলতার যে প্রমাণ স্পষ্ট হয়েছে, সভার কার্যারম্ভের পূর্বে সূত্রধাররূপে আজই তার কথা জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

এমন একদিন ছিল যখন বাংলা প্রদেশের বাইরে বাঙালি-পরিবার দুই-এক পুরুষ যাপন করতে করতেই বাঙলা ভাষা ভুলে যেত। ভাষার যোগই অন্তরের নাড়ির যোগ-

সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। বাঙালিচিত্তের যে-বিশেষত্ব মানব-সংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালি জাতির পক্ষে বড় ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব। নদীর ধারে যে-জমি আছে তার মাটিতে যদি বাঁধন না থাকে তবে তট কিছু কিছু করে ধ্বসে পড়ে। ফসলের আশা হারাতে থাকে। যদি কোনো মহা বৃক্ষ সেই মাটির গভীর অন্তরে দূরব্যাপী শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এঁটে ধরে তা হলে স্রোতের আঘাত থেকে সে ক্ষেত্র রক্ষা পায়। বাংলাদেশের চিত্তক্ষেত্রকে তেমনি করেই ছায়া দিয়েছে, ফল দিয়েছে, নিবিড় ঐক্য ও স্থায়িত্ব দিয়েছে বাংলা সাহিত্য। অল্প আঘাতেই সে খণ্ডিত হয় না। একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলাদেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে-প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরো পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঘটত, তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলাসাহিত্যে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালি উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালিচিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালীর চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালি যতদূরে যেখানেই যাক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছুকাল পূর্বে বাঙালির ছেলে বিলাতে গেলে ভাষায় ভাবে ও ব্যবহারে যেমন স্পর্ধাপূর্বক অবাঙালিত্বের আড়ম্বর করত, এখন তা নেই বললেই চলে– কেননা বাংলাভাষায় যে-সংস্কৃতি আজ উজ্জ্বল তার প্রতি শ্রদ্ধা না প্রকাশ করা এবং তার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আজ লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গেতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু, মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কি না, সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অন্য প্রদেশ বাঙালির পক্ষে প্রবাস সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশি যে, অন্য প্রদেশের

বর্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতির সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব। এছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্য প্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয় অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ, ভাবের ও সত্যের প্রকাশকল্পে বাংলাভাষা নানা প্রতিভাশালীর সাহায্যে যে রূপ এবং শক্তি উদ্ভাবন করেছে, অন্য প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তার অভিমুখিতা অন্য দিকে। অথচ সে-সকল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বাঙালি-হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয় আমরা তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখেছি, যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন। উত্তরপশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসেবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল, কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা বা সাহিত্যরসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাই বলছি, আজ প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন বাঙালির অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করছে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে বাঁকে আপন নানাদিকগামী তটকে এক করে নেয়, আধুনিক বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশ-প্রদেশের বাঙালির হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে। সাহিত্যে বাঙালি আপনাকে প্রকাশ করেছে ব'লেই, আপনার কাছে আপনি সে আর অগোচর নেই ব'লেই, যেখানে যাক আপনাকে আর সে ভুলতে পারে না। এই আত্মানুভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে নানা সম্মিলনীতে বারম্বার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

অথচ সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। রাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সামাজিক বা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে দল বাঁধা আবশ্যক হয়। কিন্তু, সাহিত্য সাধনা যার, যোগীর মত তপস্বীর মত সে একা। অনেক সময়ে তার কাজ দশের মতের বিরুদ্ধে। মধুসূদন বলেছিলেন “বিরচিব মধুচক্র’। সেই কবির মধুচক্র একলা মধুকরের। মধুসূদন যেদিন মৌচাক মধুতে ভরছিলেন, সেদিন বাংলায় সাহিত্যের কুঞ্জবনে মৌমাছি ছিলই বা কয়টি। তখন থেকে নানা খেয়ালের বশবর্তী

একলা মানুষে মিলে বাংলাসাহিত্যকে বিচিত্র করে গড়ে তুলল। এই বহু স্রষ্টার নিভৃত-তপো-জাত সাহিত্যলোকে বাংলার চিত্ত আপন অন্তরতম আনন্দভবন পেয়েছে, সম্মিলনীগুলি তারই উৎসব। বাংলাসাহিত্য যদি দল-বাঁধা মানুষের সৃষ্টি হত তা হলে আজ তার কী দুর্গতিই ঘটত তা মনে করলেও বুক কেঁপে ওঠে। বাঙালি চিরদিন দলাদলি করতেই পারে, কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘোঁট করতে, চক্রান্ত করতে, জাত মারতে তার স্বাভাবিক আনন্দ– আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি সেই “আনন্দাদ্ধ্যেব’। মানুষের সবচেয়ে নিকটতম যে-সম্বন্ধবন্ধন বিবাহব্যাপারে, গোড়াতেই সেই বন্ধনকে অহৈতুক অপমানে জর্জরিত করবার বরযাত্রিক মনোবৃত্তিই তো বাংলাদেশের সনাতন বিশেষত্ব। তার পরে কবির লড়াইয়ের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রাব্য গালিবর্ষণকে যারা উপভোগ করবার জন্যে একদা ভিড় করে সমবেত হত, কোনো পক্ষের প্রতি বিশেষ শত্রুতাবশতই যে তাদের সেই দুয়ো দেবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস তা তো নয়, নিন্দার মাদক রসভোগের নৈর্ব্যক্তিক প্রবৃত্তিই এর মূলে। আজ বর্তমান সাহিত্যেও বাঙালির ভাঙন-ধরানো মনের কুৎসামুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ননৈপুণ্য সর্বদাই উদ্যত। সেটা আমাদের ক্রূর অট্টহাস্যোদ্‌বেল গ্রাম্য অসৌজন্যসম্ভোগের সামগ্রী। আজ তো দেখতে পাই বাংলাদেশের ছোটো বড়ো খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল। এই অদ্ভুত আত্মলাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালি আপন সাহিত্যকে খান খান করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে দুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্তন করতে তার দেরি লাগত না– কিন্তু সাহিত্য যেহেতু কো-অপারেটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নয়, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়, যেহেতু সে নির্জনচর একলা মানুষের, সেইজন্যে সকলপ্রকার আঘাত এড়িয়ে ও বেঁচে গেছে। এই একটা জিনিস ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালি সৃষ্টি করতে পেরেছে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয় নি। এই সাহিত্যরচনায় বাঙালি নিজের একমাত্র কীর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে ব’লেই এই নিয়ে তার এত আনন্দ। আপন সৃষ্টির মধ্যে বৃহৎ ঐক্যক্ষেত্রে বাঙালি আজ এসেছে গৌরব করবার জন্যে। বিচ্ছিন্ন যারা তারা মিলিত হয়েছে, দূর যারা তারা পরস্পরের নৈকট্যে

স্বদেশের নৈকট্য অনুভব করছে। মহৎসাহিত্যপ্রবাহিনীতে বাঙালিচিত্তের পঙ্কিলতাও মিশ্রিত হচ্ছে ব'লে দুঃখ ও লজ্জার কারণ সত্ত্বেও ভাবনার কারণ অধিক নাই। কারণ, সর্বত্রই ভদ্রসাহিত্য স্বভাবতই সকল দেশের সকল কালের, যা-কিছু স্থায়িত্বধর্মী তাই আপনিই বাছাই হয়ে তার মধ্যে থেকে যায়; আর-সমস্তই ক্ষণজীবী, তারা গ্লানিজনক উৎপাত করতে পারে কিন্তু নিত্যকালের বাসা বাঁধবার অধিকার তাদের নেই। গঙ্গার পুণ্যধারায় রোগের বীজও ভেসে আসে বিস্তর; কিন্তু স্রোতের মধ্যে তার প্রাধান্য দেখতে পাই নে, আপনি তার শোধন এবং বিলোপ হতে থাকে। কারণ, মহানদী তো মহানর্দমা নয়। বাঙালির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত, যা সর্বমানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করবার উপযুক্ত, তাই আমাদের বর্তমানকাল রেখে দিয়ে যাবে ভাবীকালের উত্তরাধিকার রূপে। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির যে-পরিচয় সৃষ্ট হচ্ছে বিশ্বসভায় আপন আত্মসম্মান সে রাখবে, কলুষের আবর্জনা সে বর্জন করবে, বিশ্বদেবতার কাছে বাংলাদেশের অর্ঘ্যরূপেই সে আপন সমাদর লাভ করবে। বাঙালি সেই মহৎ প্রত্যাশাকে আজ আপন নাড়ীর মধ্যে অনুভব করছে বলেই বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে সম্মিলনী-আকারে পুনঃ পুনঃ বঙ্গভারতীর জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে সে প্রবৃত্ত। তার আশা সার্থক হোক, কালে কালে আসুক বাণীতীর্থপথযাত্রীরা, বাংলাদেশের হৃদয়ে বহন করে আনুক উদারতর মনুষ্যত্বের আকাঙক্ষা, অন্তরে বাহিরে সকলপ্রকার বন্ধনমোচনের সাধনমন্ত্র।

১৩৪১

সভাপতির অভিভাষণ

সাহিত্যসাধনার ভিন্ন ভিন্ন মার্গ আছে। একটি হচ্ছে কর্মকাণ্ড। সভাসমিতির সভাপতিত্ব করে দরবার জমানো, গ্রন্থাবলী সম্পাদন করা, সংবাদপত্র পরিচালনা করা, এগুলি হল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত । এই মার্গের যাঁরা পথিক তাঁরা জানেন কেমন করে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যসংসারের কাজ চালাতে হয়। তার পরের মার্গ হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড, যেমন ইতিহাস,পুরাতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা । এর দ্বারাও সাহিত্যিক সভা জমিয়ে তুলে কীর্তিখ্যাতি হাততালি লাভ করা যায়।

আমি শিশুকাল থেকেই এই উভয় মার্গ থেকে ভ্রষ্ট । এখন বাকি রইল আর-এক মার্গ,সেটি হচ্ছে রসমার্গ । এই মার্গ অবলম্বন করে রসসাহিত্যের আলোচনা, আমি পারি বা না পারি, করে যে এসেছি সে কথা আর গোপন রইল না । বহুকাল পূর্বে নির্জনে বিরলপথে এই রসাভিসারে বার হয়েছিলুম, দূরে বংশীধ্বনি শুনতে পেয়ে। কিন্তু, এই অভিসারপথ যে নিকটের লোকনিন্দা ও লাঞ্ছনার দ্বারা দুর্গম, তা যাঁরা রসচর্চা করেছেন তাঁরাই জানেন ।

ঘরের সীমা হতে, প্রয়োজনের শাসন থেকে, অনেক দূরে বের করে নিয়ে যায় যে-তান সেই তান কানে এসে পৌঁচেছিল, তাই নিকটের বাধা সত্ত্বেও বাহির হতে হয়েছিল। তাই আজ এত বয়স পর্যন্ত বংশীধ্বনি ও গঞ্জনা দুই-ই শুনে এসেছি। যে-পথে চলেছিলাম তা হাট-ঘাটের পথ নয়। তাই আমি নিয়মের রাজ্যের ব্যবস্থা ভালো বুঝি নে। রসমার্গের পথিককে পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করে চলতে হয়, সেই কু-অভ্যাসটি আমার অস্থিমজ্জাগত। তাই নিয়মের ক্ষেত্রে আমাকে টেনে আনলে আমি কর্মের সৌষ্ঠব রক্ষা করতে পারি নে।

তবে কেন সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি হওয়া। এর প্রথম কারণ হচ্ছে যে, যিনি১ আমাকে এই পদে আহ্বান করেন তিনি আমার সম্মানার্হ, তাঁর নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, বাংলার বাইরে বাঙালির আহ্বান যখন আমার কাছে পৌঁছল, তখন আমি সে আমন্ত্রণ নাড়ীর টানে অস্বীকার করতে পারি নি। এই ডাক শুনে আমার মন কী বলছিল, আজকার অভিভাষণে সেই কথাটাই সবিস্তারে জানাব।

আজ যেমন বসন্ত-উৎসবের দিনে দক্ষিণসমীরণের অভ্যর্থনায় বিশ্বপ্রকৃতি পুলকিত হয়ে উঠেছে, ধরণীর বক্ষে নবকিশলয়ের উৎস উৎসারিত হয়েছে, আজকার সাহিত্য সম্মিলনের উৎসবে তেমনি একটি বসন্তেরই ডাক আছে। এ ডাক আজকের ডাক নয়।

কত কাল হল একদা একটি প্রাণসমীরণের হিল্লোল বঙ্গদেশের চিত্তের উপর দিয়ে বয়ে গেল, আর দেখতে দেখতে সাহিত্যের মুদ্রিত দলগুলি বাধাবন্ধ বিদীর্ণ করে বিকশিত হয়ে উঠল। বাধাও ছিল বিস্তর। ইংরাজিসাহিত্যের রসমত্ততায় নূতন মাতাল ইংরাজিশিক্ষিত ছাত্রেরা সেদিন বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করেছিল। আবার সংস্কৃতসাহিত্যের ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিত সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু, বহুকালের উপেক্ষিত ভিখারি মেয়ে যেমন বাহিরের সমস্ত অকিঞ্চনতা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন নিজে অন্তর হতে উন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ গৌরবে বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে আপন আসন অধিকার করে, অনাদৃত বাংলাভাষা তেমনি করে একদিন সহসা কোন্ ভাবাবেগের ঔৎসুক্যে আপন বহুদিনের দীনতার কূল ছাপিয়ে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে উঠল। তার সেদিনকার সেই দৈন্যবিজয়ী ভাবযৌবনের স্বরূপটিকেই আজকার নিমন্ত্রণপত্র আমার স্মৃতিমন্দিরে বহন করে এনেছে।

মানুষের পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সে যথার্থভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু, প্রকাশ তো একান্ত নিজের মধ্যে হতে পারে না। প্রকাশ হচ্ছে নিজের সঙ্গে

অন্য-সকলের সত্য সম্বন্ধে। ঐক্য একের মধ্যে নয়, অনেকের মধ্যে সম্বন্ধের ঐক্যই ঐক্য। সেই ঐক্যের ব্যাপ্তি ও সত্যতা নিয়েই, কি ব্যক্তিবিশেষের কি সমূহবিশেষের যথার্থ পরিচয়। এই ঐক্যকে ব্যাপক কণ্ঠস্বরে, গভীর কণ্ঠস্বরে পেলেই আমাদের সার্থকতা।

ভূ-বিবরণের অর্ন্তগত যে-বাংলা তার মধ্যে কোনো গভীর ঐক্যকে পাই না, কেননা বাংলাদেশ কেবল মৃন্ময় পদার্থ নয়, চিন্ময়ও বটে। তা যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতিতে আছে তা নয়, তার চেয়ে সত্যরূপে আমাদের চিৎলোকে আছে। মনে রাখতে হবে যে, অনেক পশুপক্ষীও বাংলার মাটিতে জন্মেছে। অথচ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে একাত্মিকতার বোধ আত্মীয়তার রসযুক্ত নয় বলেই বাঙালিকে ভক্ষণ করতে তার যেমন আনন্দ তেমন আর কিছুতে নয়। কোনো সাধারণ ভূখণ্ডে জন্মলাভ নামক ব্যাপারের মধ্য দিয়েই কোনো মানুষের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না।

তার পর মানুষ জাতিগত ঐক্যের মধ্য দিয়েও আপন পরিচয়কে ব্যক্ত করতে চেয়েছে। যে-সব মানুষ স্বনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের যোগে এমন একটি রাজতন্ত্র রচনা করে যার দ্বারা পররাজ্যের সঙ্গে স্বরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে, এবং সেই স্বরাজ্যসীমার শাসন ও পরস্পর সহকারিতার দ্বারা নিজেদের সর্বজনীন স্বার্থকে নিয়মে বিধৃত ও বিস্তীর্ণ করতে পারে, তারাই হল এক নেশন। তাদের মধ্যে অন্য যতরকম ভেদ থাক্ তাতে কিছুই আসে যায় না। বাঙালিকে নেশন বলা যায় না,কেননা বাঙালি এখনো আপন রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠে নি। অপর দিকে সামাজিক ধর্ম-সম্প্রদায়গত ঐক্যের মধ্যেও বিশেষ দেশের অধিবাসী আত্মপরিচয় দিতে পারে; যেমন বলতে পারে, আমরা হিন্দু, বা মুসলমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধেও বাংলায় অনৈক্য রয়েছে। তেমনি বর্ণভেদ হিসাবে যে-জাতি সেখানেও বাংলায় ভেদের অন্ত নেই। তার পরে বিজ্ঞানবাদ-অনুসারে বংশগত যে-জাতি তার নির্ণয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের দৈর্ঘ্য, বর্ণ,নাকের উচ্চতা, মাথার বেড় প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের মাপজোখ করে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সে-হিসাবে আমরা বাঙালিরা যে কোন্ বংশে জন্মেছি, পন্ডিতের মত নিয়ে তা ভাবতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হবে।

জন্মলাভের দ্বারা আমরা একটা প্রকাশলাভ করি। এই প্রকাশের পূর্ণতা জীবনের পূর্ণতা। রোগতাপ দুর্বলতা অনশন প্রভৃতি বাধা কাটিয়ে যতই সম্পূর্ণরূপে জীবধর্ম পালন করতে পারি ততই আমার জৈব ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আমার এই জৈবপ্রকাশের আধার হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি।

কিন্তু, জলস্থল-আকাশ-আলোকের সম্বন্ধসূত্রে বিশ্বলোকে আমাদের যে প্রকাশ সেই তো আমাদের একমাত্র প্রকাশ নয়। আমরা মানুষের চিত্তলোকেও জন্মগ্রহণ করেছি। সেই সর্বজনীন চিত্তলোকের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে ব্যক্তিগত চিত্তের পূর্ণতা দ্বারা আমাদের চিন্ময় প্রকাশ পূর্ণ হয়। এই চিন্ময় প্রকাশের বাহন হচ্ছে ভাষা। ভাষা না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধ অত্যন্ত সংকীর্ণ হত।

তাই বলছি, বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়; বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি। ভাষা আত্মীয়তার আধার,তা মানুষের জৈব-প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর। আজকার দিনে মাতৃভাষার গৌরববোধ বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়েছে; কারণ ভাষার মধ্য দিয়ে তাদের পরস্পরের পরিচয়সাধন হতে পেরেছে এবং অপরকেও তারা আপনার যথার্থ পরিচয় দান করতে পারছে।

মানুষের প্রকাশের দুই পিঠ আছে। এক পিঠে তার স্বানুভূতি; আর-এক পিঠে অন্য সকলের কাছে আপনাকে জানানো। সে যদি অগোচর হয় তবে সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। যদি নিজের কাছেই তার প্রকাশ ক্ষীণ হল তবে সে অন্যের কাছেও নিজেকে গোচর করতে পারল না। যেখানে তার অগোচরতা সেখানেই সে ক্ষুদ্র হয়ে রইল। আর যেখানে সে আপনাকে প্রকাশ করতে পারল সেখানেই তার মহত্ব পরিস্ফূট হল।

এই পরিচয়ের সফলতা লাভ করতে হলে ভাষা সবল ও সতেজ হওয়া চাই। ভাষা যদি অস্বচ্ছ হয়, দরিদ্র হয়, জড়তাগ্রস্ত হয়, তা হলে মনোবিশ্বে মানুষের যে-প্রকাশ তা অসম্পূর্ণ হয়। বাংলাভাষা এক সময়ে গেঁয়োরকমের ছিল। তার সহযোগে তত্ত্বকথা ও গভীর ভাব প্রকাশ করবার অনেক বাধা ছিল। তাই বাঙালিকে সেদিন সকলে গ্রাম্য বলে জেনেছিল। তাই যাঁরা সংস্কৃতভাষার চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃতশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা বঙ্গভাষায় একান্ত-আবদ্ধ চিত্তের সম্মান করতে পারেন নি। বাংলার পাঁচালি-সাহিত্য ও পয়ারের কথা তাঁদের কাছে নগণ্য ছিল। অনাদরের ফল কী হয়। অনাদৃত মানুষ নিজেকে অনাদরণীয় বলে বিশ্বাস করে; মনে করে, স্বভাবতই সে জ্যোতির্হীন। কিন্তু, এ কথাটা তো গভীর ভাবে সত্য নয়; আত্মপ্রকাশের অভাবেই তার আত্মবিস্মৃতি। যখন সে আপনাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত উপলক্ষ পায় তখন সে আর আপনার কাছে আপনি প্রচ্ছন্ন থাকে না। উপযুক্ত আধারটি না পেলে প্রদীপ আপনার শিখা সম্বন্ধে আপনি অন্ধ থাকে। অতএব, যেহেতু মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে তার ভাষা তাই তার সকলের চেয়ে বড় কাজ– ভাষার দৈন্য দূর করে আপনার যথার্থ পরিচয় লাভ করা এবং সেই পূর্ণ পরিচয়টি বিশ্বের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করা। আমার মনে পড়ে, আমাদের বাল্যকালে বাংলাদেশে একদিন ভাবের তাপস বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ এক উদ্‌বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে হঠাৎ যেন বহুদিনের কৃষ্ণপক্ষ তার কালো পৃষ্ঠা উলটিয়ে দিয়ে শুক্লপক্ষরূপে আবির্ভূত হল। তখন যে-সম্পদ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল শুধু তার জন্যেই যে আমাদের আনন্দ ছিল তা নয়। কিন্তু, হঠাৎ সম্মুখে দেখা গেল,একটি অপরিসীম আশার ক্ষেত্র বিস্তারিত। কী যে হবে, কত যে পাব, ভাবীকাল যে কোন্ অভাবনীয়কে বহন করে আনবে, সেই ঔৎসুক্যে মন ভরে উঠল।

এই যে মনে অনুভূতি জাগে যে, সৌভাগ্যের বুঝি কোথাও শেষ নেই, এই-যে হৃৎস্পন্দনের মধ্যে আগন্তুক অসীমের পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়,এতেই সৃষ্টিকার্য অগ্রসর হয়। সকল বিভাগেই এই ব্যাপারটি ঘটে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একদিন বাঙালির এবং ভারতবাসীর আশা সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ ছিল। তাই কংগ্রেস মনে করেছিল যে,যতটুকু

ইংরাজ হাতে তুলে দেবে সেই প্রসাদটুকু লাভ করেই বড়ো হওয়া যাবে। কিন্তু, এই সীমাবদ্ধ আশা যেদিন ঘুচে গেল সেদিন মনে হল যে, আমার আপনার মধ্যে যে শক্তি আছে তার দ্বারাই দেশের সকল সম্পদকে আবাহন করে আনতে পারব। এইরূপ অসীম আশার দ্বারাই অসাধ্য সাধন হয়। আশাকে নিগড়বদ্ধ করলে কোনো বড়ো কাজ হয় না। বাঙালি কোথায় এই অসীমতার পরিচয় পেয়েছে। সেখানেই যেখানে নিজের জগৎকে নিজে সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিরাজ করতে পেরেছে। মানুষ নিজের জগতে বিহার করতে না পারলে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হলে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না। তাই তো কথা আছে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার যা ধর্ম তাই আমার সৃষ্টির মূলশক্তি, আমিই স্বয়ং আমার আশ্রয়স্থল তৈরি করে তার মধ্যে বিরাজ করব। প্রত্যেক জাতির স্বকীয় সৃষ্টি তার স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে বিচিত্র আকার ধারণ করে থাকে। সে রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে আপন জগৎকে বিশেষভাবে রচনা করে তাতে সঞ্চরণ করার অধিকার লাভ করে থাকে। বাঙালি জাতি তার আনন্দময় সত্তাকে প্রকাশ করবার একমাত্র ক্ষেত্র লাভ করেছে বাংলাভাষার মধ্যে। সেই ভাষাতে একদা এমন এক শক্তির সঞ্চার হয়েছিল যাতে করে সে নানা রচনারূপের মধ্যে যেন অসম্বৃত হয়ে উঠেছিল; বীজ যেমন আপন প্রাণশক্তির উদ্‌বেলতায় নিজের আবরণ বিদীর্ণ করে অঙ্কুরকে উদ্ভিন্ন করে তেমনি আর কি। যদি তার এই শক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হত তবে তার সাহিত্য ভালো করে আত্মসমর্থন করতে পারত না। বিদেশ থেকে বন্যার স্রোতের মতো আগত ভাবধারা তাকে ধুয়ে মুছে দিত।

এমন বিলুপ্তির পরিচয় আমরা অন্যত্র পেয়েছি। ভারতবর্ষের অন্য অনেক জায়গায় ইংরাজি-চর্চা খুব প্রবল। সেখানে ইংরাজিভাষায় স্বজাতীয়ের মধ্যে, পরমাত্মীয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার হয়ে থাকে। এমন দৈন্যদশা যে, পিতাপুত্রের পরস্পরের মধ্যে শুধু ভাবের নয় সামান্য সংবাদের আদানপ্রদানও বিদেশী ভাষার সহায়তায় ঘটে। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে যে-মুখে বলে বন্দেমাতরম্ সেই মুখেই মাতৃদত্ত পরম অধিকার যে মাতৃভাষা তার অসম্মান করতে মনে কোনো আক্ষেপ বোধ করে না।

বাংলাদেশেও যে এই আত্মাবমাননার লক্ষণ একেবারে নেই তা বলতে পারি নে । তবে কিনা এ সম্বন্ধে বাঙালির মনে একটা লজ্জার বোধ জন্মেছে । আজকের দিনে বাঙালীর ডাকঘরের রাস্তায় বাংলা চিঠিরই ভিড় সব চেয়ে বেশী।

বাস্তবিক মাতৃভাষার প্রতি যদি সন্মানবোধ জন্মে থাকে তবে স্বদেশীকে আত্মীয়কে ইংরাজী লেখার মতো কুকীর্তি কেউ করতে পারে না।

এক সময়ে বাংলাদেশে এমন হয়েছিল যে ইংরাজী কাব্য লিখতে লোকের আগ্রহের সীমা ছিল না। তখন ইংরাজী রচনা ইংরাজী বক্তৃতা, অসামান্য গৌরবের বিষয় ছিল। আজকাল আবার বাংলাদেশে তারই পাল্টা ব্যাপার ঘটছে। এখন কেউ কেউ আক্ষেপ করে থাকেন যে, মাদ্রাজিরা বাঙালিদের চেয়ে ভালো ইংরাজি বলতে পারে। এই অপবাদ যেন আমরা মাথার মুকুট করে পরি।

আজকে প্রবাসের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী হঠাৎ আত্মপ্রকাশের জন্য উৎসুক হয়েছে, এই আগ্রহের কারণ হচ্ছে, বাঙালি আপন প্রাণ দিয়ে একটি প্রাণবান সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে। যেখানে বাংলার শুধু ভৌগোলিক অধিকার সেখানে সে মানচিত্রের সীমাপরিধিকে ছাড়াতে পারে না। সেখানে তার দেশ বিধাতার সৃষ্ট দেশ; সম্পূর্ণ তার স্বদেশ নয়। কিন্তু, ভাষা-বসুন্ধরাকে আশ্রয় করে যে মানসদেশে তার চিত্ত বিরাজ করে সেই দেশ তার ভূ-সীমানার দ্বারা বাধাগ্রস্ত নয়, সেই দেশ তার স্বজাতির সৃষ্ট দেশ। আজ বাঙালি সেই দেশটিকে নদী প্রান্তর পর্বত অতিক্রম করে সুদূরপ্রসারিতরূপে দেখতে পাচ্ছে, তাই বাংলার সীমার মধ্য থেকে বাংলার সীমার বাহির পর্যন্ত তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হচ্ছে। খণ্ড দেশকালের বাহিরে সে আপন চিত্তের অধিকারকে উপলব্ধি করছে।

ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে এক সময়ে বিরোধের অন্ত ছিল না। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কেমন করে হয়েছিল। শুধু কোন একজন স্কটল্যাণ্ডের রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে তা হয় নি। আসলে যখন চ্যসার প্রভৃতি কবিদের সময়ে ইংরাজি ভাষা

সাহিত্যসম্পদশালী হয়ে উঠল তখন তার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে স্কটলণ্ডকে আকৃষ্ট করেছিল। সে-ভাষা আপন ঐশ্বর্যের শক্তিতে স্কটল্যাণ্ডের বরমাল্য অধিকার করে নিয়েছিল। এমনি করেই দুই বিরোধী জাতি ভাষার ক্ষেত্রে একত্র মিলিত হল, জ্ঞানের ভাবের একই পথে সহযাত্রী হয়ে আত্মীয়তার বন্ধনকে অন্তরে স্বীকার করায় তাদের বাহিরের ভেদ দূর হল। দূরপ্রদেশবাসী বাঙালি যে বাংলাভাষাকে আঁকড়ে থাকতে চাচ্ছে, প্রবাসের ভাষাকে সে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছে করছে না, তারও কারণ এই যে, সাহিত্যসম্পদশালী বাংলা ভাষার শক্তি তার মনকে জিতে নিয়েছে। এইজন্যই, সে যতই দূরে থাক্, আপন ভাষার গৌরববোধের সূত্রে বাংলার বাঙালির সঙ্গে তার যোগ সুগভীর হয়ে রয়েছে। এই যোগকে ছেদন করতে তার ব্যথা বোধ হয়, একে উপলব্ধি করতে তার আনন্দ।

বাল্যকালে এমন আলোচনাও আমি শুনেছি যে, বাঙালি যে বঙ্গভাষার চর্চায় মন দিয়েছে এতে করে ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ভাষার শক্তি বাড়তে থাকলে তার দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করা কঠিন হয়। তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্য যদি উৎকর্ষ লাভ না করত তবে আজকে হয়তো তার প্রতি মমতা ছেড়ে দিয়ে আমরা নির্বিকার চিত্তে কোনো একটি সাধারণ ভাষা গ্রহণ করে বসতাম। কিন্তু ভাষা জিনিসের জীবনধর্ম আছে। তাকে ছাঁচে ঢেলে কলে ফেলে ফরমাশে গড়া যায় না। তার নিয়মকে স্বীকার করে নিয়ে তবেই তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। তার বিরুদ্ধগামী হলে সে বন্ধ্যা হয়। একদিন মহা-ফ্রেডরিকের সময় ফ্রান্সের ভাষার প্রতি জর্মানির লোলুপতা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সে টিঁকল না। কেননা ফ্রান্সের প্রকৃতি থেকে ফ্রান্সের ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাতে প্রাণের কাজ চালানো যায় না। সিংহের চামড়া নিয়ে আসন বা গৃহসজ্জা করতে পারি, কিন্তু সিংহের সঙ্গে চামড়া বদল করতে পারি না।

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।

মাতৃভাষায় আমাদের আপন ব্যবহারের অতীত আর-একটি বড়ো সার্থকতা আছে। আমার ভাষা যখন আমার নিজের মনোভাবের প্রকৃষ্ট বাহন হয় তখনই অন্য ভাষার মর্মগত ভাবের সঙ্গে আমার সহজ ও সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। আমি যদিচ বাল্যকালে ইস্কুল পালিয়েছি কিন্তু বুড়ো বয়সে সেই ইস্কুল আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। আমি তাই ছেলে পড়িয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীর ছাত্র এসেছে, তার মধ্যে ইংরেজি-শেখা বাঙালি ছেলেও কখনো কখনো আমরা পেয়েছি। আমি দেখেছি, তাদেরই ইংরেজি শেখানো সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। যে-বাঙালির ছেলে বাংলা জানে না, তাকে ইংরেজি শেখাই কী অবলম্বন করে। ভিক্ষুকের সঙ্গে দাতার যে-সম্বন্ধ তা পরস্পরের আন্তরিক মিলনের সম্বন্ধ নয়। ভাষাশিক্ষায় সেইটে যদি ঘটে, অর্থাৎ এক দিকে শূন্য ঝুলি আর-এক দিকে দানের অন্ন, তা হলে তাতে করে গ্রহীতাকে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু, এই ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপজীবিকাতে কখনো কল্যাণ হয় না। নিজের ভাষা থেকে দাম দিয়ে দিয়ে তার প্রতিদানে অন্য ভাষাকে আয়ত্ত করাই সহজ।

সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতা লাভ করবে তখনই অন্য দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়। যে-নদী আমার গ্রামের কাছ দিয়ে বহমান, তাতে যেমন গ্রামের এপারে ওপারে খেয়া-পারাপার চলে তেমনি আবার তাতে পণ্যদ্রব্য বহন করে বিদেশের সঙ্গে কারবার হতে পারে। কেননা সেই বহমান নদীর সঙ্গে অন্যান্য নানা নদীর সম্বন্ধ সচল।

য়ুরোপে এক সময়ে লাটিন ভাষা জ্ঞানচর্চার একমাত্র সাধারণ ভাষা ছিল। যতদিন তা ছিল তত দিন য়ুরোপের ঐক্য ছিল বাহ্যিক আর অগভীর। কিন্তু, আজকার দিনে য়ুরোপ নানা বিদ্যাধারার সন্মিলনের দ্বারা যে-মহত্ত্ব লাভ করেছে সেটি আজ পর্যন্ত অন্য কোনো মহাদেশে ঘটে নি। এই ভিন্ন-ভিন্ন-দেশীয় বিদ্যার নিরন্তর সচল সম্মিলন কেবলমাত্র য়ুরোপে নানা দেশের নানা ভাষার যোগেই ঘটেছে, এক ভাষার দ্বারা কখনো ঘটতে পারত

না। আজকার দিনে য়ুরোপে রাষ্ট্রীয় অসাম্যের অন্ত নেই কিন্তু তার বিদ্যার সাম্য আজও প্রবল। এই জ্ঞান-সন্মিলনের উজ্জ্বলতায় দিক্‌বিদিক্ অভিভূত হয়ে গেছে। সেই মহাদেশে দেয়ালি-উৎসবের যে বিরাট আয়োজন হয়েছে তা সমাধা করতে সেখানকার প্রত্যেক দেশ তার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে এনেছে। যেখানে যথার্থ মিলন সেখানেই যথার্থ শক্তি। আজকের দিনে য়ুরোপে যথার্থ শক্তি তার জ্ঞানসমবায়ে।

আমাদের দেশেও সেই কথাটি মনে রাখতে হবে। ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরাজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু, এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র। যেখানে হৃদয়ের বিনিময় হয়, সেখানে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকলেই তবে যথার্থ মিলন হতে পারে। কিন্তু, যদি বাহ্য বন্ধনপাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শত্রুতা। কারণ, সে মিলন শৃঙ্খলের মিলন, অথবা শৃঙ্খলার মিলনমাত্র।

রাশিয়া তার অধিকৃত ছোটো ছোটো দেশের ভাষাকে মেরে রাশীয় ভাষার অধিকারভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল, বেলজিয়াম ফ্লেমিশ্‌দের ভাষা ভোলাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু, ভাষার অধিকার যে ভৌগোলিক অধিকারের চেয়ে বড়ো, তাই এখানে জবরদস্তি খাটে না। বেলজিয়াম ফ্লেমিশ্‌দের অনৈক্য সইতে পারে নি, তাই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধনে তাদের বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু,সে-ঐক্য অগভীর বলে তা স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। সাম্রাজ্যবন্ধনের দোহাই দিয়ে যে-ঐক্যসাধনের চেষ্টা তা বিষম বিড়ম্বনা। আজ য়ুরোপের বড়ো বড়ো দাসব্যবসায়ী নেশনরা আপন অধীন গণবর্গকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে বিষম কশাঘাত করে তার ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের রথ চালিয়ে দিয়েছে। রথের বাহন যে-ঘোড়াকয়টি তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা নেই। কিন্তু, সারথির তাতে আসে যায় না। তার মন রয়েছে এগিয়ে চলার দিকে, তাই সে রথের ঘোড়াকটাকে কষে বেঁধে, টেনে-হিঁচড়ে প্রাণপ্রণে চাবকাচ্ছে। নইলে তার গতিবেগ যে

থেমে যায়। এমন বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর স্টীম-রোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। কিন্তু, পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না। অরণ্যের বিভিন্ন পত্রপুষ্পের মধ্যে যে-ঐক্য আছে তা হল বসন্তের ঐক্য। কারণ, বসন্তসমাগমে ফাল্গুনের সমীরণে তাদের সকলেরই মঞ্জুরী মুকুলিত হয়ে ওঠে। তাদের বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে বসন্তের একই বাণীর চলাচলের পথ, সেখানেই তারা এক ও মিলিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জবরদস্ত লোকেরা বলে থাকে যে, মানুষকে বড়োরকমের বাঁধনে বেঁধেছেঁদে মেরে কেটেকুটে প্রয়োজন সাধন করতে হবে- এমন দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধলেই নাকি ঐক্য সাধিত হতে পারে। অদ্বৈতের মধ্যে যে পরমমুক্ত শিব রয়েছেন তাঁকে তারা চায় না। তারা বেঁধেছেঁদে দ্বৈতকে বস্তাবন্দী করে যে অদ্বৈতের ভান তাকেই মেনে থাকে। কিন্তু যাঁরা যথার্থ অদ্বৈতকে অন্তরে লাভ করেছেন তাঁরা তো তাঁকে বাইরে খোঁজে না। বাইরে যে-এক তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব; আর অন্তরের যে-এক তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পঞ্চত্ব, আর-একটা হল পঞ্চায়েৎ।

আজকার এই সাহিত্যসন্মিলনে বাংলাদেশের প্রতিবেশী অনেক বন্ধুও সমাগত হয়েছেন। তাঁরা যদি এই সন্মিলনে সমাগত হয়ে নিমন্ত্রণের গৌরবলাভে মনের মধ্যে কোনো বাধাবোধ না করে থাকেন তবে তাতে অনেক কাজ হয়েছে। আমরা যেন বাঙালির স্বাজাত্য-অভিমানের অভিমাত্রায় মিলনযজ্ঞে বিঘ্ন না বাধাই। দক্ষ তো আপন আভিজাত্যের অভিমানেই শিবকে রাগিয়ে দিয়েছিলেন।

যে-দেশে হিন্দি ভাষার প্রচলন সে-দেশে প্রবাসী বাঙালি বাংলাভাষায় ক্ষেত্র তৈরী করেছে, এতে বাঙালিদের এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই উত্তরভারতে কাশীতে তাঁরা কী পেলেন, দেখলেন, আত্মীয়দের সহযোগিতায় কী লাভ করলেন, তা আমাদের জানাতে হবে। আমরা দূরে যারা বাস করি তারা এখানকার এ-সবের সঙ্গে পরিচিত নই; উত্তরভারতের লোককে আমরা মানচিত্র বা গেজেটিয়ারের সহযোগে দেখেছি। বাঙালি যখন আপন ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় বিস্তার করে

সৌহার্দ্যের পথ মুক্ত করবেন তাতে কল্যাণ হবে। ভালোবাসার সাধনার একটা প্রধান সোপান হচ্ছে জ্ঞানের সাধনা।

পরস্পরের পরিচয়ের অভাবই মানুষের প্রভেদকে বড়ো করে তোলে। যখন অন্তরের পরিচয় না হয় তখন বাইরের অনৈক্যই চোখে পড়ে, আর তাতে পদে পদে অবজ্ঞার সঞ্চার হয়ে থাকে। আজ বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে উত্তরভারতের সঙ্গে সেই আন্তরিক পরিচয়ের প্রবাহ বাংলার অভিমুখে ধাবিত হোক। এখানকার সাহিত্যিকেরা আধুনিক ও প্রাচীন উত্তরভারতীয় সাহিত্যের যে শ্রেষ্ট সম্পদ, যা সকলের শ্রদ্ধা উৎপাদন করবার যোগ্য, তা সংগ্রহ করে দূরে বাংলাদেশে পাঠাবেন– এমনিভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলার সঙ্গে উত্তরভারতের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবে।

আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আশ্চর্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি। প্রাচীন হিন্দি কবিদের এমন-সকল গান তাঁর কাছে শুনেছি যা শুনে মনে হয় সেগুলি যেন আধুনিক যুগের। তার মানে হচ্ছে, যে-কাব্য সত্য তা চিরকালই আধুনিক। আমি বুঝলুম, যে-হিন্দিভাষার ক্ষেত্রে ভাবের এমন সোনার ফসল ফলেছে সে-ভাষা যদি কিছুদিন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকে তবু তার স্বাভাবিক উর্বরতা মরতে পারে না; সেখানে আবার চাষের সুদিন আসবে এবং পৌষমাসে নবান্ন-উৎসব ঘটবে। এমনি করে এক সময় আমার বন্ধুর সাহায্যে এ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার যোগ স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমের সঙ্গে সেই শ্রদ্ধার সম্বন্ধটি যেন আমাদের সাধনার বিষয় হয়। মা বিদ্বিষাবহৈ।

আজ বসন্তসমাগমে অরণ্যের পাতায় পাতায় পুলকের সঞ্চার হয়েছে। গাছের যা শুকনো পাতা ছিল তা ঝরে গেল। এমন দিনে যারা হিসাবের নীরস পাতা উলটাতে ব্যস্ত আছে তারা এই দেশব্যাপী বসন্ত-উৎসবের ছন্দে যোগ দিতে পারল না। তারা পিছনে পড়ে রইল। দেশে আজ যে পোলিটিকাল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে তার যতই মূল্য থাক্, জ্ঞএহ বাহ্যঞ্চ। এর সমস্ত লাভ-লোকসানের হিসাবের চেয়ে অনেক বড়ো কথা রয়ে গেছে

সেই সুগভীর আত্মিক-প্রেরণার মধ্যে যার প্রভাবে এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এমন স্বচ্ছন্দবিকাশ হয়েছে। স্বাস্থ্যের যে স্বাভাবিক প্রাণগত ক্রিয়া আছে, তা অগোচরে কাজ করে বলে ব্যস্তবাগীশ লোকেরা তার চেয়ে দাওয়াইখানার জয়েন্ট স্টক কোম্পানিকে ঢের বড়ো বলে মনে করে– এমন-কি, তার জন্যে স্বাস্থ্য বিসর্জন করতেও রাজি হয়। সম্মানের জন্যে মানুষ শিরোপা প্রার্থনা করে, এবং তার প্রয়োজনও থাকতে পারে, কিন্তু শিরোপা দ্বারা মানুষের মাথা বড়ো হয় না। আসল গৌরবের বার্তা মস্তিষ্কেই আছে, শিরোপায় নেই; প্রাণের সৃষ্টিঘরে আছে, দোকানের কারখানাঘরে নেই। বসন্ত বাংলার চিত্ত-উপবনে প্রাণদেবতার দাক্ষিণ্য নিয়ে এসে পৌঁচেছে, এ হল একেবারে ভিতরকার খবর, খবরের কাগজের খবর নয়; এর ঘোষণার ভার কবিদের উপর। আমি আজ সেই কবির কর্তব্য করতে এসেছি; আমি বলতে এসেছি, অহল্যাপাষাণীর উপর রামচন্দ্রের পদস্পর্শ হয়েছে– এই দৃশ্য দেখা গেছে বাংলাসাহিত্যে, এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো আশার কথা। আজ বাংলা হতে দূরেও বাঙালিদের হৃদয়ক্ষেত্রে সেই আশা ও পুলকের সঞ্চার হোক। খুব বেশি দিনের কথা নয়, বড়ো জোর ষাট বছরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য কথায় ছন্দে গানে ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই শক্তির এইখানেই শেষ নয়। আমাদের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হোক। আমরা এই শক্তিকে চিরজীবিনী করি। যেখানেই মানবশক্তি ভাষায় ও সাহিত্যে প্রকাশমান হয়েছে সেইখানেই মানুষ অমরতা লাভ করেছে ও সর্বমানবসভায় আপন আসন ও বরমাল্য পেয়েছে।

অল্প কয়েকদিন পূর্বেই মার্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানকার অধ্যাপক ডাক্তার অটো আমাকে লিখেছেন যে, তাঁরা শান্তিনিকেতনে বাংলাসাহিত্যের চর্চা করবার জন্য একজন অধ্যাপককে পাঠাতে চান। তিনি এখান থেকে শিক্ষালাভ করে ফিরে গেলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার জ্ঞচেয়ারঞ্চ সৃষ্টি করা হবে। এই ইচ্ছা দশ বছর আগে কোনো বিদেশীর মনে জাগে নি।

আজ বঙ্গবাণীর উৎস খুলে গেল। যারা তার ধারার সন্ধানে ছুটে এল তাদের পরিবেশনের ভার আমাদের উপর রয়েছে। আমাদের আশা ও সাহস থাকলে এই

ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঘটতে পারবে। আমরা সকলে মিলিত হয়ে সেই ভাবীকালের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকব। এই অধ্যবসায়ে বাংলা যদি বিশেষ গৌরব অর্জন করে সে কি সমগ্র ভারতবর্ষের সামগ্রী হবে না। গাছের যে-শাখাতেই ফুল ফুটুক সে কি সকল গাছের নয়। অরন্যের যে-বনস্পতিটি ফুলে ফলে ভরে উঠল যদি তারই উদ্দেশে মধুকরেরা ছুটে আসে তবে সমগ্র অরণ্য তাদের সমাদরে বরণ করে লয়। আজ বাংলার প্রাঙ্গণেই যদি অতিথিদের সমাগম হয়ে থাকে তবে তাতে ক্ষতি কী। তাঁরা যে ভারতবর্ষেরই ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়েছেন, ভারতবাসীদের তা মানতে হবে। বঙ্গসাহিত্য আজ পরম শ্রদ্ধায় সেই মধুব্রতদের আহ্বান করুক।

১: প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

১৩৩০

সভাপতির শেষ বক্তব্য

আমাদের দৈহিক প্রকৃতিতে আমরা দেখতে পাই যে, তার কতকগুলি বিশেষ মর্মস্থান আছে– যেমন, প্রাণের যে-প্রবাহ রক্তচলাচলের সহযোগে অঙ্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় তার মর্মস্থান হচ্ছে হৃৎপিণ্ড; আর, ইন্দ্রিয়বোধের যে-ধারা স্নায়ুতন্তু অবলম্বন ক'রে দেহে বিস্তৃত হয়েছে, তার কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক। তেমনি প্রত্যেক দেশের চিত্তে যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা প্রবহমান, তার এক-একটি মর্মস্থান আপনিই সৃষ্ট হয়ে থাকে।

পশ্চিম-মহাদেশে আমরা দেখতে পাই যে, ফ্রান্সের চিত্তের কেন্দ্রভূমি প্যারিস, ইতালীর রোম, ও প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স। হিন্দু-ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তেমনি দূরে দূরে যত বিদ্যার উৎস উৎসারিত হয়েছে তার ধারা সর্বদাই কোনো-না-কোনো উপলক্ষে কাশীতে এসে মিলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে রাধাকুমুদবাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বৈদিক যুগে কাশী ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার কেন্দ্র ছিল, তার পরে বৌদ্ধযুগে যখন বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হলেন তখন তিনি কাশীতেই ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। মধ্যযুগেও যত কবি, ভক্ত সাধু, কোনো-কোনো সূত্রে এই নগরীর সঙ্গে তাদের জীবন ও কর্মকে মিলিত করেছেন। আজকার দিনে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের যে-উদ্যম বঙ্গভাষায় প্রকাশ পেয়েছে ও বাংলায় নবজীবনের সঞ্চার করেছে, এটি কেবল সংকীর্ণ ভাবে বাংলার জিনিস নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ একটি বড়ো উদ্যমের প্রকাশ। সুতরাং স্বতই যদি এর একটা বেগ কাশীতে এসে পৌঁছয়, তবে তাতে ক'রে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে।

নবজাত শিশু জন্মলাভ করে প্রথমে আপন গৃহে, কিন্তু তার পর ক্রমে ক্রমে জাত-সংস্কারের দ্বারা সে সমাজে স্থান পায়। তেমনি ভারতবর্ষের সকল প্রচেষ্টাগুলির যেখানে জন্ম সেখানেই তারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না, তাদের অন্য সংস্কারের প্রয়োজন যার দ্বারা সেগুলি সর্বভারতের জিনিস ব'লে নিজের ও অন্যের কাছে প্রমাণিত হতে পারে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা আপন ভূগোলগত সীমায় স্বীয় বিশেষত্বকে আপন সাহিত্যে

চিত্রকলায় প্রকাশ করুক, তাকে উজ্জ্বল করতে থাক্, কিন্তু তার প্রাণের প্রাচুর্য বাংলার বাইরেও নানা প্রতিষ্ঠান অবলম্বন ক'রে আপন শাখা বিস্তার যদি করে তবে কাশী তার সেই আত্মপ্রসার-উদ্যমের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান হতে পারে। কারণ, কাশী বস্তুত ভারতবর্ষের কোনো বিশেষ প্রদেশভুক্ত নয়, কাশী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই।

এই প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হল তার প্রধান আকাঙক্ষাটি কী। তা হচ্ছে এই যে, বঙ্গসাহিত্যের ফল যেন ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের হস্তে সহজে নিবেদন করে দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে যে-সকল তীর্থস্থান আছে তার সর্বপ্রধান কাজই হচ্ছে এই যে, সেখানে যাতে সকল প্রদেশের লোক আপন প্রাদেশিক সত্তার চেয়ে বড়ো সত্তাকে উপলব্ধি করে। সমস্ত হিন্দু-ভারতবর্ষের যে-একটি বিরাট ঐক্য আছে সেটি প্রত্যক্ষ অনুভব করবার স্থান হচ্ছে এই-সব তীর্থ। পুরী প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থের চেয়ে কাশীর বিশেষত্ব এই যে, এখানে যে কেবল ভক্তিধারার সংগমস্থান তা নয়, এখানে ভারতীয় সমস্ত বিদ্যার মিলন হয়েছে। বাংলাপ্রদেশ আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে যদি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের যোগে কাশীর সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তবে সে জিনিসটিকে ভারতের ভারতী প্রসন্নমনে গ্রহণ করবেন।

বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে শুধু বাংলারই শক্তি বদ্ধ হয়ে রয়েছে, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না; কেননা সমগ্র ভারতবর্ষের নাড়ীর মধ্যে দিয়েই বাংলার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হয়েছে, তাই বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা ভারত চিত্তশক্তিরই বিশেষ প্রকাশ বলে জানতে হবে। এই কথা স্মরণ করবার স্থান হোক সেই বারাণসী যেখানে বাংলার ন্যায়ের অধ্যাপক দ্রবিড়ের শ্রুতির অধ্যাপকের সঙ্গে একত্র বসে ভারতের একই ডালিতে বিদ্যার অর্ঘ্যকে সম্মিলিত ক'রে সাজিয়ে তুলছেন।

পরিশেষে আমি একটি কাজের কথা বলতে চাই। বাঙালিরা যে এ দেশে বাস করছেন আমরা বাংলাভাষার মধ্যে তার পরিচয় পাব এই আশা করি। বাঙালি কি সেই পরিচয় দিয়েছে। না, দেয় নি। এটা কি আমাদের চিত্তের অসাড়তার লক্ষণ নয়। যে-চিত্ত যথার্থ

প্রাণবান তার ঔৎসুক্য চির-উদ্যমশীল। নির্জীব মনেরই দেখবার ইচ্ছা নেই, দেখবার শক্তি নেই। যা- কিছু তার থেকে পৃথক, সমবেদনার দুর্বলতাবশত তাকে সে অবজ্ঞা করে। এই অবজ্ঞা অজ্ঞতারই নামান্তর। জানবার শক্তির অভাব এবং ভালোবাসার শক্তির অভাব একসঙ্গেই ঘটে। যে-মানুষ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে সেই তো মানুষকে শ্রদ্ধা করতে পারে; আত্মার ক্ষীণতাবশতই যার সেই মহৎ অধিকার নেই, দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর বেশি যে এগোতে পারে না, অহংকারের দ্বারা সেই তো আপনার দৈন্যকেই প্রকাশ করে। মমত্বের অভাব মাহাত্ম্যেরই অভাব।

বাঙালির প্রধান রিপু হচ্ছে এই আত্মাভিমান, যেজন্য নিরন্তর নিজের প্রশংসাবাদ না শুনতে পেলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাকে অহরহই স্তুতির মদ ঢোঁকে ঢোকে গেলাতে হয়, তার কমতি হলেই তার অসুখ বোধ হয়। এই চাটুলোলুপ আত্মাভিমান সত্যের অপলাপ বলেই এতে যে মোহান্ধকার সৃষ্টি করে তাতে অন্যকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না। এই অন্ধতা দ্বারা আমরা নিজেকে বঞ্চিত করি। আমি জাপানে বাঙালি ছাত্রদের দেখেছি, তারা জাপানে বোতাম-তৈরি সাবান-তৈরি শিখতে গেছে, কেউ কেউ বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত, কিন্তু জাপানকে সম্পূর্ণ চোখ মেলে দেখবার আগ্রহ তাদের মনের মধ্যে গভীর ভাবে নেই। যদি থাকত তা হলে বোতাম-শিক্ষার চেয়ে বড়ো শিক্ষা তাদের হত। তারা জাপানকে শ্রদ্ধা করতে না পারার দ্বারা নিজেদের অশ্রদ্ধেয় করেছে। যে-সব বাঙালি উত্তর-পশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল বা অল্পকাল বাস করছে তারা যদি এই মোহান্ধতার বেষ্টন থেকে নিজেদের মুক্ত না করে, তা হলে এখানকার মানবসংস্রব থেকে তাদের সাহিত্য কিছুই সংগ্রহ করতে পারবে না। যে-কয়েদি গারদের বাইরে রাস্তায় এসে কাজ করে সেও যেমন বন্দী, তেমনি যে-বাঙালি আপন ঘর থেকে দূরে সঞ্চরণ করতে আসে তারও মনের পায়ে অভিমান ও অশ্রদ্ধার বেড়ি পরানো। এই উপেক্ষার ভাবকে মন থেকে না তাড়াতে পারলে কাশীর মতো স্থানে সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালির প্রতিষ্ঠান নিরর্থক হবে। বাঙালির চিন্তাপরায়ণ বীক্ষণশীল মন যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংস্পর্শে এসেছে তারই প্রমাণ বঙ্গসাহিত্যে ফলবান হয়ে দেখা দেবে, তবেই এখানকার বঙ্গসাহিত্য পরিষৎ নিতান্ত একটা বাহুল্য ব্যাপার বলে গণ্য হবে না। এখানকার ভাষা, সাহিত্য, এখানকার স্থানীয় অভিজ্ঞতা থেকে যা-কিছু তথ্য ও তত্ত্ব

সংগ্রহ করা সম্ভব তা সমস্তই বাংলাসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে নিযুক্ত হবে এখানকার বাঙালি-সাহিত্যিক-সংঘ থেকে এই আমরা বিশেষভাবে আশা করি।

এ দেশে যে-সব বহুমূল্য পুঁথি আছে তা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে। আমি জানি, একজন জাপানি পুরোহিত নেপাল থেকে তিন-চার সিন্ধুক বোঝাই করে মহাযান-বৌদ্ধশাস্ত্র জাপানে চালান করে দিয়েছেন। এজন্য সংগ্রহকারকে দোষ দেব কী করে। যারা চেয়েছিল তারা পেয়েছে, যারা চায় নি তারা হারালো, এই তো সংগত। কিন্তু, এইবেলা সতর্ক হতে হবে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং রক্ষা করবার একটি প্রশস্ত স্থান হচ্ছে কাশী। এখানকার বঙ্গসাহিত্যপরিষদের সভ্যেরা এই কাজকে নিজের কাজ বলে গণ্য করবেন, এই আমি আশা করি।

আমাদের প্রাচীন কীর্তির যা ভগ্নাবশেষ চারি দিকে ছড়িয়ে আছে আন্তরিক শ্রদ্ধার দ্বারা তাদের রক্ষা করতে হবে। আমি দেখেছি, কত ভালো ভালো মূর্তির টুকরো অনেক জায়গায় পা-ধোবার পিঁড়ি বা সিঁড়ির ধাপে পরিণত করা হয়েছে। এই পদাঘাত থেকে এদের বাঁচাতে হবে। আধুনিক কালে পুরাতন শিল্পের যা-কিছু নিদর্শন তার অধিকাংশ পশ্চিমভারতেই বিদ্যমান আছে। বাংলার নরম মাটিতে তার অধিকাংশ তলিয়ে গেছে। কিন্তু, এখানকার পাথুরে জায়গায়, কঠিন ভূমিতে, পুরাতন কীর্তি রক্ষিত হয়েছে; তার ভগ্নাবশেষ ছড়াছড়ি যাচ্ছে। আপনারা শ্রদ্ধাসহকারে তা সংগ্রহ করুন, এখানে যে “সারস্বত-ভাণ্ডার’ স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছে তা যেন আপনাদের স্থায়ী কাজে প্রবৃত্ত করে, আজকের সভায় এই আমার অনুরোধ। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমরা ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর করি নি। তাকে আপনার জিনিস বলে বরণ করে নিই নি। তাই আশ্চর্য অমূল্য ছবি- সব পথে-ঘাটে সামান্য দরে বিকিয়ে যেত, আমরা চেয়ে দেখি নি।

এক সময়ে, মনে আছে, জাপান থেকে কলাসৌন্দর্যের রসজ্ঞ ওকাকুরা বাংলাদেশে এসে এ দেশের চিত্রকলা ও কারুশিল্পের যথার্থ মূল্য আমাদের অশিক্ষিত দৃষ্টির কাছে প্রকাশ করলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করবার পক্ষে কলিকাতার আর্ট

স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু, ভারতের চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাজনিত যে-অবজ্ঞা সে আজও সম্পূর্ণ ঘোচে নি। এইজন্যেই আমাদের দেশের উদাসীন মুষ্টি থেকে ভারতের চিত্রসম্পদ অতি সহজে স্খলিত হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। এখানকার পরিষৎ এইগুলিকে সংগ্রহ করাকে যদি নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেন তা হলে ধন্য হবেন।

সকল দেশেই বিদ্যার একটা ধারাবাহিকতা আছে। মূল-উৎস থেকে নদীর ধারা বন্ধ হয়ে গেলে যেমন তা বদ্ধ জলের কুণ্ডে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি জ্ঞানের তপস্যা বা কলার সাধনায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ যদি অবরুদ্ধ হয়ে যায় তা হলে সে-সমস্ত ক্ষীণ হয়ে বিলুপ্ত হতে থাকে। ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে আমরা তার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। অজন্তার চিত্রকলায় যে-ধারা ছিল সে-ধারা অনেক দিন বয় নি, তাই ভারতের চিত্রকলা পঙ্ককুণ্ডে অবরুদ্ধ হয়ে ক্রমে তলার পাঁকে এসে ঠেকেছে। এই ধারাকে যথাসাধ্য উন্মুক্ত করা চাই তো। কিন্তু, প্রাচীন ভারতের ভালো ভালো সব ছবিই যদি বিদেশে চালান যায়, তা হলে আমাদের দেশে চিত্রকলার বিদ্যাকে সজীব ও সচল রাখা কঠিন হবে। আমাদের আধুনিক চিত্রে প্রাচীন চিত্রকলার অনুকরণ করতে হবে, এমন কথা বলি নে। কিন্তু, অতীতের সাধনার মধ্যে যে-একটি প্রাণের বেগ আছে সেই বেগটি আমাদের চিত্তের প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। অতীতের সৃষ্টিপ্রবাহকে বর্তমান কালের সৃষ্টির উদ্যমের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করলে সেই উদ্যমকে সহায়হীন করা হয়। শুধু নিজেদের অতীত কেন, অন্য দেশের বিদ্যা থেকে আমরা যা পাই তার প্রধান দান হচ্ছে এই উদ্যম। এইজন্যে য়ুরোপে, যেখানে দেশ-বিদেশের সমস্ত মানব-সংসার থেকে সকলরকম বিদ্যার সমবায় ঘটছে, সেখানে সাধনার উদ্যম এমন আশ্চর্যরূপে বেড়ে উঠছে। এই কথাটি মনে ক'রে আমাদের দেশের অতীতের লুপ্তপ্রায় সমস্ত কীর্তির যথাসম্ভব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা যেন করি, তাদের পুনরাবৃত্তি করবার জন্যে নয়, নিজেদের চিত্তকে সাধনার বৃহৎ ক্ষেত্রে জাগরূক রাখবার জন্যে।

১৩৩০

সাহিত্যরূপ

আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েছে এই ইচ্ছা করে যে, নবীন প্রবীণ সকলে মিলে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করব; কোনো চরম সিদ্ধান্ত পাকা করে দেওয়া যাবে তা মনে করে নয়। অনেক সময়ে আমরা ঝগড়া করি পরস্পরের কথা স্পষ্ট বুঝি না বলে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের মনে ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতা আমরা অনেক সময়ে কল্পনা করে নিই; তাতে করে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তর মিশে যায়, তখন কোনোপ্রকার আপস হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। মোকাবিলায় যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হব তখন আশা করি এ কথা বুঝতে কারো বিলম্ব হবে না যে, যে-জিনিসটা নিয়ে তর্ক করছি সেটা আমাদের দুই পক্ষেরই দরদের জিনিস, সেটা বাংলাসাহিত্য। এই মূল জায়গায় আমাদের মিল আছে; এখন অমিলটা কোথায় সেটা শান্তভাবে স্থির করে দেখা দরকার।

আমার বয়স একদা অল্প ছিল, তখন সেকালের অল্পবয়সীদের সঙ্গে একাসনে বসে আলাপ করা সহজ ছিল। দীর্ঘকাল সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তার কারণ এই নয় যে, আমার পক্ষে কোনো বাধা আছে। এখনকার কালে যাঁরা চিন্তা করছেন, রচনা করছেন, বাংলাসাহিত্যে নেতৃত্ব নেবার যাঁরা উপযুক্ত হয়েছেন বা হবেন, তাঁরা কী মনের ভাব নিয়ে আসরে নেবেছেন সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সহজভাবে আলাপ-আলোচনা করবার পক্ষে তাঁদের মনের মধ্যে হয়তো কোনো অন্তরায় আছে। এ নিয়ে অনেকে আমাকেই অপরাধী করেন। তাঁরা বলেন, আমি না জেনে অনেক সময় অনেক কথা বলে থাকি। এটা অসম্ভব নয়। আজকের দিনে বাংলাভাষায় প্রতিদিন যে-সব লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তা সমস্ত পড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। সে শক্তিও নেই, অবকাশেরও অভাব আছে। সেই কারণেই আজকের মতো এইরকম উপলক্ষে নূতন লেখকদের কাছ থেকে রচনা-নীতি ও রীতি সম্বন্ধে তাঁদের অন্তরের কথা কিছু শুনে নেব, এই ইচ্ছা করি।

আলোচনাটাকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রসঙ্গটার একটা গোড়াপত্তন করে দেওয়া ভালো।

এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকের চেয়ে আমার বয়স বেশি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য যে-যুগে আরম্ভ হয়েছিল সে আমার জন্মের অদূরবর্তী পূর্বকালে। সেইজন্যে এই সাহিত্যসূত্রপাতের চিত্রটি আমার কাছে সুস্পষ্ট।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়ল জলের ভিতর থেকে।

আমরা দেখলুম কী। কোনো একটা নূতন বিষয়? তা নয়, একটা নূতন রূপ। সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে, পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতরবিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি। রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়। বলা বাহুল্য, মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিল। যাতে সেই লক্ষ্যের দিকে আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা

ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি করে তুললেন। রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো করলেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে-রূপের সম্পদ পেল সেইটেতেই সে ধন্য হল। মিল্‌টন ইংরেজিভাষায় লাটিন-ধাতুমূলক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহার করার দ্বারায় তার ধ্বনিরূপের যে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, মাইকেলেরও তদনুরূপ আকাঙক্ষা ছিল। যদি বিষয়ের গাম্ভীর্যই যথেষ্ট হত তা হলে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এ কথা সত্য, বাংলাসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ, মাইকেল বাংলাভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তাঁরই একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলাভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে-ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। তাঁর পরে হেম বাঁড়ুয্যে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন; এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হল স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কি না, এবং তাঁদের এই রূপের ছাঁদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কি না, সে তর্ক এখানে করতে চাই নে- কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা-বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চলবে; তাঁরা চিন্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি ধর্মনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন্ কোঠা খুলে দিয়েছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার্য নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।

মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বললেন, প্রতিভা আপন-সৃষ্ট নব নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি সেই একই কথা। তিনি গল্পসাহিত্যের এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্বেকার গল্পসাহিত্যের ছিল মুখোশ-পরা রূপ, তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে

দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। হোমার, বর্জিল, মিল্‌টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু, এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিসটাকে সংকীর্ণ করে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো-একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন; সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন। এক দিক থেকে এটা অনুকরণ, আর-এক দিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার। যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদান-প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেছে। মূলধন নিজের না হতে পারে, ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে ব্যাবসা না হয় শুরু হল, তা নিয়ে যতক্ষণ কেউ মুনাফা দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনারই। যদি ফেল করে তবেই প্রকাশ পায় ধনটা তার নিজের নয়। আমরা জানি, এশিয়াতে এমন এক যুগ ছিল যখন পারস্যে চীনে গ্রীসে রোমে ভারতে আর্টের আদর্শ চালাচালি হয়েছিল। এই ঋণ-প্রতিঋণের আবর্তন-আলোড়নে সমস্ত এশিয়া জুড়ে নবনবোন্মেষশালী একটি আর্টের যুগ এসেছিল– তাতে আর্টিস্টের মন জাগরূক হয়েছিল, অভিভূত হয় নি। অর্থাৎ, সেদিন চীন পারস্য ভারত কে কার কাছ থেকে কী পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেছে সে কথাটা চাপা পড়েছে, তাদের প্রত্যেকের স্বকীয় মুনাফার হিসাবটাই আজও বড়ো হয়ে রয়েছে। অবশ্য, ঋণ-করা ধনে ব্যাবসা করবার প্রতিভা সকলের নেই। যার আছে সে ঋণ করলে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যিক স্কট বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য এই যে, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন। অর্থাৎ, তাঁর হাতে সেটা মরা বীজের মতো শুকনো হয়ে ব্যর্থ হল না। কথাসাহিত্যের নতুন রূপ প্রবর্তন করলেন; তাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিলেন। তারা বললে না যে, এটা বিদেশী; এই রূপকে তারা স্বীকার করে নিলে। তার কারণ, বঙ্কিম এমন একটি সাহিত্যরূপে আনন্দ পেয়েছিলেন, এবং সেই রূপকে আপন ভাষায় গ্রহণ করলেন, যার

মধ্যে সর্বজনীন আনন্দের সত্য ছিল। বাংলাভাষায় কথাসাহিত্যের এই রূপের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। রূপের এই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তারই পূজা চালালেন তিনি বাংলাসাহিত্যে। তার কারণ, তিনি এই রূপের রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ নয় যে, গল্পের কোনো একটি থিওরি প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। “বিষবৃক্ষ’ নামের দ্বারাই মনে হতে পারে যে, ঐ গল্প লেখার আনুষঙ্গিকভাবে একটা সামাজিক মতলব তাঁর মাথায় এসেছিল। কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীকে নিয়ে যে-একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভালো নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল, এ আমি বিশ্বাস করি নে- ওটা হঠাৎ পুনশ্চনিবেদন; বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপশ্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।

নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন।

ইংরেজি সাহিত্যের থেকে দেখা যাক। একদিন সাহিত্যের আসরে পোপ ছিলেন নেতা। তাঁর ছিল ঝক্‌ঝকে পালিশ-করা লেখা; কাটাকোটা ছাঁটাছোঁটা জোড়াদেওয়া দ্বিপদীর গাঁথনি। তাতে ছিল নিপুণ ভাষা ও তীক্ষ্ণ ভাবের উজ্জ্বলতা, রসধারার প্রবাহ ছিল না। শক্তি ছিল তাতে, তখনকার লোকে তাতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিল।

এমন সময়ে এলেন বার্‌ন্‌স্। তখনকার শান-বাঁধানো সাহিত্যের রাস্তা, যেখানে তক্‌মা-পরা কায়দাকানুনের চলাচল, তার উপর দিয়ে হঠাৎ তিনি প্রাণের বসন্ত- উৎসবের যাত্রীদের চালিয়ে নিলেন। এমন একটি সাহিত্যের রূপ আনলেন যেটা আগেকার সঙ্গে মিলল না। তার পর থেকে ওয়ার্ড্‌স্বার্থ, কোল্‌রিজ, শেলি, কীট্‌স্ আপন আপন কাব্যের স্বকীয় রূপ সৃষ্টি করে চললেন। সেই রূপের মধ্যে ভাবের বিশিষ্টতাও আছে, কিন্তু ভাবগুলি রূপবান হয়েছে ব'লেই তার গৌরব। কাব্যের বিষয় ভাষা ও রূপ সম্বন্ধে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের বাঁধা মত ছিল, কিন্তু সেই বাঁধা মতের মানুষটি কবি নন; যেখানে সেই-সমস্ত মতকে বেমালুম পেরিয়ে গেছেন সেইখানেই তিনি কবি। মানবজীবনের সহজ সুখদুঃখে প্রকৃতির

সহজ সৌন্দর্যে আনন্দই সাধারণত ওয়ার্ড্‌স্বার্থের কাব্যের অবলম্বন বলা যেতে পারে। কিন্তু, টম্‌সন্‌ একেন্‌সাইড প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনার মধ্যেও এই বিষয়টি পাওয়া যায়। কিন্তু, বিষয়ের গৌরব তো কাব্যের গৌরব নয়; বিষয়টি রূপে মূর্তিমান যদি হয়ে থাকে তা হলেই কাব্যের অমরলোকে সে থেকে গেল। শরৎকালকে সম্বোধন করে কীট্‌স্‌ যে-কবিতা লিখেছেন তার বিষয় বিশ্লেষণ করে কীই বা পাওয়া যায়; তার সমস্তটাতেই রূপের জাদু।

য়ুরোপীয় সাহিত্য আমার যে বিশেষ জানা আছে, এমন অহংকার আমি করি নে। শুনতে পাই, দান্তে, গ্যটে, ভিক্টর হুগো আপন আপন রূপের জগৎ সৃষ্টি করে গেছেন। সেই রূপের লীলায় ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের আনন্দ। সাহিত্যে এই নব নব রূপস্রষ্টার সংখ্যা বেশি নয়।

এই উপলক্ষে একটা কথা বলতে চাই। সম্প্রতি সাহিত্যের যুগ-যুগান্তর কথাটার উপর অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে “যুগ’ ব’লে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্ন-ওয়ালা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে– বোঝাই সারা হলে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার পরে আবার নতুন মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়।

সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনিক ও পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এইরকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো-একটা চাপরাশের জোরে যে-সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায়, জানব, তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে ব’লেই চাপরাশের দেমাক

বেশি হয়। য়ুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেছে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেছে সেই লিখেছে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীলদর্পণ নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টিকর্তা। ওর মধ্যে যুগের তকমাটাই সাহিত্যের লক্ষণ বানিয়ে বসে নি। আজকের দিনে বারো-আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তা হলেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হবে না- কেননা তার পনেরো আনাই হবে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন; সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু, সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। কোনো-একটা উদ্ভটরকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গি বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি এ কথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হল, সেও অসংগত। পাগলামির মতো অপূর্ব আর কিছুই নেই, কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যালিটি বলে গ্রহণ করতে পারি নে। সেটা নূতন কিন্তু কখনোই চিরন্তন নয়- যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিস বলা যায় না।

কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিজের সাহিত্যিক পালাটা সাঙ্গ করে চলে যেতে পারেন; কিন্তু তিনি যে একটা-কোনো যুগকে চুকিয়ে দিয়ে যান কিম্বা আর- একজন যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভাকে প্রকাশ করেন তিনি আর-একটা যুগকে এনে হাজির করে দেন, এটা অদ্ভুত কথা। একজন সাহিত্যিক আর-একজন সাহিত্যিককে লুপ্ত করে দিয়ে যান না, তাঁর একটা পাতার পরে আর-একটা পাতা যুক্ত করে দেন। প্রাচীন কালে যখন কাগজ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না তখন একজনের লেখা চেঁচে মেজে তারই উপরে আর-একজন লিখত- তাতে পূর্বলেখকের চেয়ে দ্বিতীয় লেখকের অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণ হত না, এইমাত্র প্রমাণ হত যে, দ্বিতীয় লেখকটি পরবর্তী। এক যুগ আর-এক যুগকে লুপ্ত না করে আপনার স্থান পায় না, এইটেই যদি সত্য হয় তবে তাতে কেবল কালেরই পূর্বাপরতা প্রমাণ হয়; তার চেয়ে বেশি কিছু নয়- হয়তো দেখা যাবে, ভাবীকাল উপরিবর্তী লেখাটাকে মুছে ফেলে তলবর্তীটাকেই উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। নূতন কাল উপস্থিতমত খুবই প্রবল-

তার তুচ্ছতাও স্পর্ধিত। সে কিছুতেই মনে করতে পারে না যে, তার মেয়াদ বেশিক্ষণের হয়তো নয়। কোনো- এক ভবিষ্যতে সে যে তার অতীতের চেয়েও জীর্ণতর প্রমাণিত হতে পারে, এ কথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন। এইজন্যেই অতি অনায়াসেই সে দম্ভ করে যে, সেই চরম সত্যের পূর্বতন ধারাকে সে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। এ কথা মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সম্পদ চিরযুগের ভাণ্ডারের সামগ্রী- কোনো বিশেষ যুগের ছাড়পত্র দেখিয়ে সে আপনার স্থান পায় না।

যদি নিজের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি, আশা করি, আপনারা মাপ করবেন। আমার বাল্যকালে আমি দুই-একজন কবিকে জানতুম। তাঁদের মতো লিখতে পারব, এই আমার আকাঙক্ষা ছিল। লেখবার চেষ্টাও করেছি, মনে কখনো কখনো নিশ্চয়ই অহংকার হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অতৃপ্তিও ছিল। সাহিত্যের যে-রূপটা অন্যের, আমার আত্মপ্রকাশকে কোনোমতে সেই মাপের সঙ্গে মিলিয়ে তোলবার চেষ্টা কখনোই যথার্থ আনন্দ হতে পারে না। যা হোক, বাল্যকালে যখন নিজের অন্তরে কোনো আদর্শ উপলব্ধি করতে পারি নি, তখন বাইরের আদর্শের অনুবর্তন করে যতটুকু ফল লাভ করা যেত সেইটেকেই সার্থকতা বলে মনে করতুম।

এক সময়ে যখন আপন মনে একলা ছিলুম, একখানা স্লেট হাতে মনের আবেগে দৈবাৎ একটা কবিতা লিখতেই অপূর্ব একটা গৌরব বোধ হল। যেন আপন প্রদীপের শিখা হঠাৎ জ্বলে উঠল। যে লেখাটা হল সেইটের মধ্যেই কোনো উৎকর্ষ অনুভব করে যে আনন্দ তা নয়। আমার অন্তরের শক্তি সেই প্রথম আপন রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তেই এতদিনের বাইরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলুম। তখনকার দিনের প্রবীণ সাহিত্যিকরা আমার সেই কাব্যরূপটিকে সমাদর করেন নি, পরিহাসও করেছিলেন। তাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নি, কেননা আমার আদর্শের সমর্থন আমার নিজেরই মধ্যে, বাইরেকার মাপকাঠির সাক্ষ্যকে স্বীকার করবার কোনো দরকারই ছিল না। সেদিন যে-কাব্যরূপের দর্শন পেলুম সে নিঃসন্দেহই কোনো-একটা বিষয় অবলম্বন করে এসেছিল, কিন্তু আনন্দ সেই বিষয়টিকে নিয়ে নয়; সেই বিষয়ের মধ্যে কোনো অসামান্যতা ছিল বলেই তৃপ্তি বোধ

করেছি তাও নয়। আত্মশক্তিকে অনুভব করেছিলুম কোনো-একটি প্রকাশরূপের স্বকীয় বিশিষ্টতায়। সে-লেখাটি মোটের উপর নিতান্তই কাঁচা; আজকের দিনে তা নিয়ে গৌরব করতে পারি নে। সেদিন আমার যে-বয়স ছিল আজ সে-বয়সের যে-কোনো বালক কবি তার চেয়ে অনেক ভালো লিখতে পারেন। তখনকার কালের ইংরেজি বা রাশীয় বিশেষ একটা পদ্ধতির সঙ্গে আমার সেই লেখাটা খাপ খেয়ে গেল এমন কথা বলতে পারি নে। আজ পর্যন্ত জানি নে, কোনো একটা যুগ-যুগান্তরের কোঠায় তাকে ফেলা যায় কি না। আমার নিজেরই রচনার স্বকীয় যুগের আরম্ভসংকেত ব'লে তাকে গণ্য করা যেতে পারে।

এই রূপসৃষ্টির আবির্ভাব একই কবির জীবনে বার বার ঘটে থাকে। রচনার আনন্দের প্রকাশই হচ্ছে নব নব রূপে। সেই নবরূপ-আবির্ভাবের দিনে প্রত্যেক বারেই অন্তরের প্রাঙ্গণে শাঁখ বেজে ওঠে, এ কথা সকল কবিই জানে। আমার জীবনে, মানসী, সোনার তরী, ক্ষণিকা, পলাতকা আপন বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়েই উৎসব করেছে। সেই রূপের আনন্দেই রচনার বিষয়গুলি হয়েছে সার্থক। বিষয়গুলি অনিবার্য কারণে আপনিই কালোচিত হয়ে ওঠে। মানবজীবনের মোটা মোটা কথাগুলো আন্তরিক ভাবে সকল সময়েই সমান থাকে বটে কিন্তু তার বাইরের আকৃতি-প্রকৃতির বদল হয়। মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র কালে কালে বিস্তৃত হতে থাকে। আগে হয়তো কেবল ঋষি মুনি রাজা প্রভৃতির মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রকাশ কবিদের কাছে স্পষ্ট ছিল; এখন তার পরিধি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিষয়ের বৈচিত্র্য কালে কালে ঘটতে বাধ্য। কিন্তু, যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি তখন কোন্ কথাটা বলা হয়েছে তখন তার উপরে ঝোঁক থাকে না, কেমন করে বলা হয়েছে সেইটের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি দিই। ডারুয়িনের অভিব্যক্তিবাদের মূল কথাটা হয়তো মানবসাহিত্যে কখনো-না-কখনো বলা হয়েছে, জগদীশচন্দ্র বৃক্ষের মধ্যে প্রাণের যে-স্বরূপটি দেখাচ্ছেন হয়তো মোটামুটিভাবে কোনো একটা সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে তার আভাস থাকতে পারে- কিন্তু তাকে সায়ান্স্ বলে না; সায়ান্সের একটা ঠাট আছে, যতক্ষণ সেই ঠাটের মধ্যে কোনো-একটা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা না যায় ততক্ষণ তার বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছুই নেই। তেমনি বিষয়টি যত বড়োই হিতকর বা অপূর্ব হোক-না কেন যতক্ষণ সে কোনো-একটা সাহিত্যরূপের মধ্যে

চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না। রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত, এইটেতেই যাঁর একমাত্র গৌরব তিনি উঁচুদরের মানুষ হতে পারেন, কিন্তু কবি নন, সাহিত্যিক নন।

আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে স্তব্ধ নয়। তার চলতি ধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাটে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কালই তা আবর্জনাকুণ্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব' লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কালচারের লক্ষণ ব'লে মানি। চলতি স্রোতে যা-কিছু সব-শেষে আসে তারই যে সব চেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ববর্তী আদর্শ বাতিল হয়ে যায় এবং ভাবীকালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুব রূপ পায়, এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এইজন্যে মাঝে মাঝে সে সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মুর্ছা আক্ষেপ দেখা দেয়– তার মধ্যে যদি প্রাণের জোর থাকে তবে এ-সমস্তই সে আবার কাটিয়ে যায়। কিন্তু, দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই। মনে করি, তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী, যেহেতু এটা আধুনিক। সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনই প্রকাশ পায় যখনই দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। আজকালকার দিনে য়ুরোপে নানা কারণে তার ধর্ম সমাজ লোকব্যবহার স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত বেশি নাড়া খাওয়াতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই-সমস্ত সমস্যার মীমাংসা না হলে তার বাঁচাও নেই। এই একান্ত উৎকণ্ঠার দিনে এই সমস্যার দল বাছবিচার করতে পারছে না। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা যেমন প্রয়োজনের দায়ে গৃহস্থের ঘর ও ভাণ্ডার দখল করে বসে, তেমনি প্রব্লেমের রেজিমেন্ট তাদের নিজের বারিক ছাপিয়েও সাহিত্যের সর্বত্রই ঢুকে পড়ছে। লোকে আপত্তি করছে না, কেননা সমস্যাসমাধানের দায় তাদের অত্যন্ত বেশি। এই উৎপাতে সাহিত্যের বাসা যদি প্রব্লেমের বারিক হয়ে ওঠে তবে এ প্রশ্ন মারা যায় যে, স্থাপত্য-কলার আদর্শে এই ঘরের রূপটি কী। প্রয়োজনের গরজ যেখানে অত্যন্ত বেশি সেখানে রূপ জিনিসটা অবান্তর। য়ুরোপে

সাহিত্যের সব ঘরই প্রব্লেমের ভাণ্ডারঘর হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে; তাই প্রতিদিনই দেখছি, সাহিত্যে রূপের মূল্যটা গৌণ হয়ে আসছে। কিন্তু, এটা একটা ক্ষণকালীন অবস্থা- আশা করা যেতে পারে যে, বিষয়ের দল বর্তমানের গরজে দাবি ক্রমে ত্যাগ করবে এবং সাহিত্যে রূপের স্বরাজ আবার ফিরে আসবে। মার্শাল ল যেখানে কোনো কারণে চিরকালের হয়ে ওঠে সেখান থেকে গৃহস্থকে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করাই কর্তব্য। বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তা হলে বলতেই হবে, এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।

সভায় আমার বক্তব্য শেষ হলে পর অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ বললেন : কাব্যসাহিত্যের বিশিষ্টতা ভাবের প্রগাঢ়তায় (Intensity)। কবি টম্‌সন্‌ ঋতুবর্ণনাচ্ছলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, এইখানে ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গে তাঁর কাব্যবিষয়ের মিল আছে, কিন্তু পরস্পরের প্রভেদের কারণ হচ্ছে এই যে, টম্‌সনের কবিতায় কাব্যের বিষয়টির গভীরতা নেই, বেগ নেই ওয়ার্ড্‌স্বার্থের সেটি আছে।

আমি বললুম : তুমি যাকে প্রগাঢ়তা বলছ সেটা বস্তুত রূপসৃষ্টিরই অঙ্গ। সুন্দর দেহের রূপের কথা যখন বলি তখন বুঝতে হবে, সেই রূপের মধ্যে অনেকগুলি গুণের মিলন আছে। দেহটি শিথিল নয়, বেশ আঁটসাট, তা প্রাণের তেজে ও বেগে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যসম্পদে তা সারবান, ইত্যাদি। অর্থাৎ, এইরকমের যতগুলি গুণ তার বেশি, তার রূপের মূল্যও তত বেশি। এই-সব গুণগুলি একটি রূপের মধ্যে মূর্তিমান হয়ে যখন অবিচ্ছিন্ন ঐক্য পায় তখন তাতে আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি। নাইটিঙ্গেল পাখিকে উদ্দেশ্য করে কীট্‌স্‌ একটি কবিতা লিখেছেন। তার মাঝখানটায় মানবজীবনের দুঃখতাপ ও নশ্বরতা নিয়ে বিশেষ একটি বেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু, সেই বেদনার তীব্রতাই কবিতার চরম কথা নয়; মানবজীবন যে দুঃখময়, এই কথাটার সাক্ষ্য নেবার জন্যে কবির দ্বারে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই- তা ছাড়া, কথাটা একটা সর্বাঙ্গীণ ও গভীর সত্যও নয়- কিন্তু এই নৈরাশ্যবেদনাকে উপলক্ষমাত্র করে ঐ কবিতাটি যে একটি বিশেষ রূপ ধরে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেইটিই হচ্ছে ওর কাব্যহিসাবে সার্থকতা। কবি পৃথিবী সম্বন্ধে বলছেন –

Here, where men sit and hear each other groan;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs;
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs;
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-morrow

একে ইন্‌টেন্সিটি বলা চলে না, এ রুগ্‌ণ চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে– তৎসত্ত্বেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান কবিতা। যে ভাবটিকে দিয়ে কবি কাব্য সৃষ্টি করলেন সেটি কবিতাকে আকার দেবার একটা উপাদান।

দেবালয় থেকে বাহির হয়ে গোধূলির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সুন্দরী চলে গেল, এই একটি তথ্যকে কবি ছন্দে বাঁধলেন–

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনী মন্দিরবাহির ভেলি,
নবজলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম– সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে রয়ে গেল। আর-একজন কবি দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণনা করছেন। বিষয়-হিসাবে স্বভাবতই মনের উপর তার প্রভাব আছে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে, অন্নের অভাবে আমানি খেয়ে তাকে পেট ভরাতে হয়– তাও যে পাত্রে করে খাবে এমন সম্বল নেই, মেজেতে গর্ত করে আমানি ঢেলে খায়– দরিদ্র-নারায়ণকে আর্তস্বরে দোহাই পাড়বার মতো ব্যাপার। কবি লিখলেন–

দুঃখ করো অবধান,
দুঃখ করো অবধান,

আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।

কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না। কিন্তু, সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না; ভাব ভাষা ভঙ্গি সমস্তটা জড়িয়ে একটা মূর্তি সৃষ্টি হল কি না এইটেই লক্ষ্য করবার যোগ্য। “তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে’– দারিদ্র্যদুঃখের বিষয়-হিসাবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য-হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামান্য পাণ্ডিত্য; সেইটি অপর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করবার জন্যে বঙ্কিম তার মুখে ষড়্‌দর্শনের আস্ত আস্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু, পাঠক বলত, আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাই নে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায় ভঙ্গিতে আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানেই বঙ্কিম হলেন কারিগর, সেইখানে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের বিষয়গত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল আপন সৃষ্টির কাজ করে। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নবযুগ অবতারণ করেছেন কি না তা নিয়ে সাহিত্যের তরফে আমরা প্রশ্ন করব না; আমাদের প্রশ্ন এই যে, তাঁদের নিয়ে সাহিত্যে নিঃসংশয় সুপ্রত্যক্ষ কোনো একটি চারিত্ররূপ জাগ্রত করা হল কি না। পূর্বযুগের সাহিত্যেই হোক, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে : হে গুণী, কোন্ অপূর্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি করলে।

১৩৩৫

সাহিত্যসমালোচনা

আমার দুটি কথা বলবার আছে। এক, আমরা গেল বারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে।১ সে রিপোর্ট যথাযথ হয় নি। অনেকদিন এ সম্বন্ধে দুঃখবোধ করেছি, কখনো কোনো রিপোর্ট ঠিকমত পাই নি। সেদিন নানা আলোচনার ভিতর সব কথা ঠিক ধরা পড়েছে কি না জানি নে। আর-একটা বিপদ আছে, কোনো-কিছু সম্বন্ধে যখন যে-কেউ রিপোর্ট নিতে ইচ্ছা করেন তার নিজের মতামত খানিকটা সেটাকে বিচলিত করে থাকে। এটুকু জানিয়ে রাখছি যে, যদি এ সম্বন্ধে রিপোর্ট বেরোয় আমাকে দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। তারও প্রয়োজন নেই, একটু সংযতভাবে চিত্তকে স্থির রেখে যদি লেখেন। এর দরকার আছে, কেননা এ সম্বন্ধে এখনো উত্তেজনা আছে– সেজন্য অল্পমাত্র যদি বিকৃতি ঘটে তা হলে অন্যায় হবে।

দ্বিতীয় কথা, আমি সতর্ক করতে চাই, ব্যক্তিগতভাবে এই তর্কে আমার কোনো স্থান নাই। এমন কথা নয় যে, আমি এক পক্ষে আছি, আর আধুনিক সাহিত্য আর-এক পক্ষে আছে। এরকম ভাবে তর্ক উঠলে আমি কুণ্ঠিত হব। বর্তমান কালে আমার লেখা মুখরোচক হোক বা না-হোক, আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি নে। লোকমতের কী মূল্য আজকের দিনে আমার বুঝবার মতো বয়স হয়েছে। অল্প বয়স যখন ছিল তখন অবশ্য বুঝি নি, তখন লোকমতকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দিতাম। অন্যের মত অনুযায়ী লিখতে পারলে, অন্যকে অনুকরণ করতে পারলে, সত্য কাজ কিছু করা গেল কল্পনা করেছি– সে যে কত বড়ো অসত্য, বার বার, হাজার বার তা প্রমাণ হয়ে গেছে আমার এই জীবনে। আমি তার উপর বিশেষ কোনো আস্থা রাখি না। আমাকে কেউ পছন্দ করুন বা না-করুন, এখন আমার চেয়ে ভালো লিখতে পারুন বা না-পারুন, সে আলোচনা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

আমি সেদিন যে-আলোচনা উত্থাপিত করেছিলাম সে-প্রসঙ্গে আমার মত আমি ব্যক্ত করেছি। সাহিত্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে, নীতি সম্বন্ধে, যা বক্তব্য সে আমার লেখায় বার বার বলেছি। গত বারে সে কথা কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এখনকার যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম কিম্বা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি জানি, আমি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ করে লিখি নি। কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্যধর্ম-বিগর্হিত মনে হয়েছিল। তাতে সমাজধর্মের যদি কোনো ক্ষতি করে থাকে, সমাজরক্ষার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা সে-বিষয়ে চিন্তা করবেন; আমি সে দিক থেকে কখনো আলোচনা করি নি। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানুষ যে-সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায়, চিরকালের চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে-মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য প্রচার, মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়– তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।

সংসারধর্মে মানবচরিত্রে সত্যের সেই-সব প্রকাশকে তাঁরা চিরকালের মূল্য দিয়েছেন, যাকে তাঁরা সর্বকাল ও সর্বজনের কাছে ব্যক্ত করবার ও রক্ষা করবার যোগ্য মনে করেছেন। যার মধ্যে তাঁরা সৌন্দর্য দেখেছেন, মহিমা দেখেছেন, তাই তাঁদের রচনার আনন্দকে জাগিয়েছে। বাল্মীকি যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অনুভব করলেন, এ ছন্দ কোনো মহৎ চরিত্র, কোনো পরম অনুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে, এমন কিছু যাতে মানবজীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তখনকার লোক মনুষ্যত্বের কোন্ রূপকে শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন। কলাবান বাক্য যে-বিষয়কে প্রকাশ করে তাকে আপন অলংকারের দ্বারা স্থায়ী মূল্য দেয়। সেকালের কবি খুব প্রকাণ্ড পটের উপর খুব বড়ো ছবি এঁকেছেন এবং তাতে মানুষকে বড়ো দেখে মানুষ আনন্দ পেয়েছে। আমাদের মনের ভিতর যে-সব বেদনা, যে-সব আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং আমরা যাকে অন্তরে অন্তরে খুব আদর করি, সেই আদরের যোগ্য ভাষা পাই না ব'লে বাইরে প্রকাশ করতে পারি না, পূজা করতে পারি না, অর্ঘ্য দিতে পারি না। আমাদের সে-সম্পদ নেই,

আমরা মন্দির রচনা করতে জানি না, যাঁরা রচনা করেন ও যাঁরা দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন আমরা তাঁদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের পূজা সেখানে দিই। বড়ো বড়ো জাতি সাহিত্যে বড়ো বড়ো পূজার জন্যে আমাদের অবকাশ রচনা করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ সেখানে তাঁদের অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ লাভ করে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছে। সমাজের প্রভাতকালে প্রকাণ্ড একটা বীরত্বদীপ্ত প্রাণসম্পদপূর্ণ মনুষ্যত্বের আনন্দময় চিত্র মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে কবিরা রচনা করতে বেরিয়েছেন। অনেক সময় সমাজের পাথেয় নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং বাইরের নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে ক্রমে পতন ঘটে। এইজন্য যেটা মানুষের সভ্যতার অতি-পরিণতি তাতে বিকৃতি আসে, এরূপ পরিচয় আমরা প্রাচীন গ্রীস রোম ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বারংবার পেয়েছি। অবসাদের সময়ে কলুষটাই প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেহপ্রকৃতিতে অনেক রোগের বীজ আছে। শরীরের সবল অবস্থায় সেগুলি পরাহত হয়েই থাকে। এমন নয় যে তারা নেই। তাদের পরাভূত ক'রে আরোগ্যশক্তি অব্যাহত থাকে। যে-মুহূর্তে শরীর ক্লান্ত হয়, জীর্ণ হয়, দুর্বল হয়, তখন সেগুলি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ইতিহাসেও বারংবার এটা দেখেছি। যখন কোনো-একটা প্রবৃত্তি বা মনের ভাব প্রবল হয় তখন তার প্রবলতাকে চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস না করে থাকতে পারি না, তাকে একান্তভাবে অনুভব করি বলেই। সেই অনুভূতির জোরে প্রবৃত্তিকে নিয়ে আমরা বড়াই করতে শুরু করি। এইজন্য এক-একটা সময় আসে যখন এক-একটা জাতির মধ্যে মানুষের ভিতরকার বিকৃতিগুলিই উগ্র হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজিসাহিত্যের ভিতর যখন অত্যন্ত একটা কলুষ এসেছিল সে উদ্ধত হয়েই নির্লজ্জ হয়েই আপনাকে প্রকাশ করেছিল। তার পর আবার সেটা কেটে গেছে। ফরাসীবিপ্লবের সময় ইংরেজ কবিদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহের কথা বলেছেন; প্রচলিত সমাজনীতি, প্রচলিত ধর্মনীতিকে গুরুতর আঘাত করেছেন। মানুষের মনকে কর্মকে মোহমুক্ত করে পূর্ণতা দান করবার জন্যে তাঁদের কাব্যে সাহিত্যে খুব একটা আগ্রহ দেখা গেছে। তখনকার সমাজে তাঁদের কাব্য নিন্দিত হয়েছে, কিন্তু কালের হাতে তার সমাদর বেড়ে গেল। এ দিকে বিশেষ কোনো যুগে যে-সব লালসার কাব্যকীর্তন প্রকাশিত হয়েছিল তারা

সেকালের বিদগ্ধদের কাছে সম্মান পেয়েছে; মনে হয়তো হয়েছিল, এইটেই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। তবু পরে প্রকাশ পেয়েছে, এ জিনিসটা সেই যুগের ক্ষণকালীন উপসর্‌গ।

আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যেও এই বিকৃতি অনেক দেখা গিয়েছে। যখন সংস্কৃতসাহিত্যে সাধনার দৈন্য এসেছিল তখন কাব্যে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বর্তমান কালের আরম্ভে কবির লড়াই, পাঁচালি, তর্জা প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে-বিকার দেখা দিয়েছিল সেগুলিতে বীর্যবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাঙক্ষার পরিচয় নেই। তার ভিতর অত্যন্ত পঙ্কিলতা আছে। সমাজের পথযাত্রার পাথেয় হচ্ছে উৎকর্ষের জন্যে আকাঙক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হয়ে যায় বলেই মনে তার জন্যে যে-আকাঙক্ষা আছে তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই– তাকে সংসারযাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর করে উপলব্ধি করি। এই আকাঙক্ষা যতক্ষণ মহৎ থাকে এবং এই আকাঙক্ষার প্রকাশ যতক্ষণ লোকের কাছে মূল্য পায়, ততক্ষণ সে জাতির মধ্যে যতই দোষ থাক্‌, তার বিনাশ নেই। য়ুরোপীয় জাতির ভিতর যে-অস্বাস্থ্য রয়েছে তার প্রতিকারও তাদের মধ্যে আছে। যেখানে স্বাস্থ্যের প্রবলতা সেখানে রোগও আপাতত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মানুষ বাঁচে। দুর্বল শরীরে তার প্রকাশ হলে সে মরে।

আমরা এখন একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি। এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রতিকূলতার সঙ্গে। আমাদের সমস্ত চিত্তকে ও শক্তিকে জাগরূক করে আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তা হলেই আমরা বাঁচব। নইলে পদে পদে আমাদের পরাভব। আমাদের মজ্জার ভিতর জীর্ণতা; এইজন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে আমাদের যেটা তপস্যার দান সেটাকে যেন আমরা নষ্ট না করি, তপোভঙ্গ যেন আমাদের না হয়। মানবজীবনকে বড়ো করে দেখার শক্তি সব চাইতে বড়ো শক্তি। সেই শক্তিকে আমরা যেন রক্ষা করি। সংকীর্ণতা প্রাদেশিকতার দ্বারা সে-শক্তিকে আমরা খর্ব করব না। এজন্যে আমাদের অনেক লড়াই করতে হবে। সে লড়াই করতে না পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। যুদ্ধের পথেই আমরা বীর্য পাব। যে-আত্মসংযমের দ্বারা মানুষ বড়ো শক্তি পেয়েছে তাকে অবিশ্বাস করে যদি বলি, সেটা পুরানো ফ্যাশন, এখন তার

সময় গেছে, তা হলে আমাদের মৃত্যু। যে-ফল এখনো পাকবার সময় হয় নি তার ভিতর পোকা ঢুকেছে, এই আক্ষেপ মনের ভিতর যখন জাগে তখন সেটাকে কেউ যেন ব্যক্তিগত কলহের কথা বলে না মনে করেন।

যে-সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হতে পারত যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে, বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষসঞ্চার হয়েছে। এই মনের আক্ষেপ নিয়ে হয়তো কিছু বলে থাকব। বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন, এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নাই, অসংযতভাবে তাঁরা যা বলে সেটা এখনকার ডেমোক্রাটিক সাহিত্যে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তা হলে বলতে হবে, তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। যদি কেউ বলেন, আমরা সে দলের নই, আমি খুশি হব। মানুষের জন্য, দেশের জন্য, সমাজের জন্য যাঁরা কাজ করেন, ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সংযমের ভিতর দিয়েই করেন। কেউ যেন কখনো না বলেন উন্মত্ততার দ্বারা পৃথিবীর উপকার করব।

যাকে শ্রদ্ধা বলে তা সৃষ্টি করে, অশ্রদ্ধা নষ্ট করে। যদি বলি, আমি বড়োকে শ্রদ্ধা করি না, তা হলে শুধু যে বড়োকে আঘাত করি তা নয়, সৃষ্টির শক্তিকে একেবারে নষ্ট করি, সেটা আমাদের পতনের কারণ হয়। যারা বিজয়ী হয়েছে তারা শ্রদ্ধার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে জয় করেছে। বড়ো বড়ো যুদ্ধে যে-সকল সেনাপতিরা জিতেছেন তাঁরা হারতে হারতেও বলেছেন “আমরা জিতেছি’, কখনো হারকে স্বীকার করতে চান নি। সেটা উপস্থিত তথ্যের বিরোধী হতে পারে। হয়তো হেরেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু তাঁরা নিজেকে শ্রদ্ধা করেছেন, তার দ্বারা হারের ভিতর দিয়ে জয়কে সৃষ্টি করেছেন। শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত জাতির জয়সম্পদকে সৃষ্টি করা যায়। যখন দেখি, জাতির মনে অশ্রদ্ধা আসন পেতে মহৎকে অট্টহাসির দ্বারা বিদ্রূপ করতে থাকে, তখন সব-চাইতে বেশি আশঙ্কা হয়, তখন হতাশ হয়ে বলতে হয়, পরাভবের সময় এল। আমাদের সিদ্ধি সে তো দূরে রয়েছে, কিন্তু তার অগ্রগামী দূত যে-শ্রদ্ধা সেও যদি না থাকে তা হলে তার চেয়ে এমনতরো সর্বনাশ আর কিছু হতে পারে না।

আমার নিজের লেখাতে যেটা বিকৃত সেটার নজির দেখাতে পারেন, অসম্ভব কিছু নয়। দীর্ঘকালের লেখার ভিতরে কখনো কলুষ লাগে নি, এ কথা বলতে পারব না। যদি বলি, যা-কিছু লিখেছি সমস্ত শ্রদ্ধেয়, সমস্ত ভালো, অতবড়ো দাম্ভিকতা আর-কিছু হতে পারে না। অনেক রকমের অনেক লেখার মধ্য থেকে খুঁটে খুঁটে যেগুলি নিজের পক্ষ সমর্থন করে সেগুলিই যদি গ্রহণ করি তবে তার দ্বারা শেষ কথা বা সম্পূর্ণ কথা বলা হবে না।

আজকের সভায় ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, নিন্দা-প্রশংসার কথা নয় – ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে যাঁরা সাহিত্যের সত্যকে মনের ভিতর দেখতে পেয়েছেন তাঁরা আপনাদের মনের কথা বলবেন, এই বিশ্বাসেই এই সভা আহ্বান করেছিলাম, আমি আশা করেছিলাম সাহিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত যাঁদের আছে তাঁরা সেটা সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করবেন। কোন্ নীতির ভিত্তির উপর সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে, কোন্ সাহিত্য মানুষের কাছে চিরকালের গৌরব পাওয়ার যোগ্য, সেই সম্বন্ধে কারো কিছু বিশেষ ভাবে বলবার থাকলে সেইটাই বলবেন, এই সংকল্প করেই আমি আপনাদের ডেকেছি। আমি কখনো মনে করি নি, আমার পক্ষের কথা বলে সকলের কথাকে চাপা দেব। আমার নিবেদন এই যে, আপনারা আমার উপর রাগ না করে আপনাদের মত সভায় ব্যক্ত করুন। আমার যেটা মত সেটা আমারই মত। যদি বলেন, এ মত সেকেলে, পুরোনো, তা হলে সেটাকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে রাজি আছি। যে-মত নিয়ে কাজ করেছি, লিখেছি, সেটা সত্য জেনেই করেছি, তাকে যদি মূঢ়তা বলে বিচার করেন করুন। আমার সাফাই জবাব থাকে দিতে চেষ্টা করব। আমরা এতদিন যা ভেবে এসেছি সেটা চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হতেও পারে। এতকাল যা হয়েছে এখন থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ উলটা রকমের ব্যাপার হবে, এরকমই যদি আপনাদের মত হয় বলুন। সেদিন আপনাদের কেউ কেউ বললেন, আমার সঙ্গে তাঁদের মতের পার্থক্য নেই, সেটাও স্পষ্ট করে বলা দরকার।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় : সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।

রবীন্দ্রনাথ : সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয় কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন এক সময় আমাদের দেশে একান্নবর্তী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। সমাজব্যবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, সে-পরিবর্তন যে কারণেই হোক– ধর্মনৈতিক কারণেই যে সব সময় হয় তা নয়, অধিকাংশ স্থলে অর্থনৈতিক কারণেও হয়– তখন একটি কথা ভাববার আছে। তৎকালীন যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবল ছিল, যার প্রয়োজন ছিল, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্য কতকগুলো বিধিনিষেধ পাকা করে দেওয়া হয়। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রয়োজন চলে যায়, অথচ নিয়ম শিথিল হতে চায় না। সমাজ অন্ধভাবেই আপন নিয়ম আঁকড়ে থাকে। সে বলে, যে-কারণেই হোক, একটাও নিয়ম আলগা হলেই সব নিয়মের জোর চলে যায়। সকল মানুষই সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধি খাটাবার অধিকার দাবি করলে সমাজ টিকতে পারে না। সমাজের পক্ষে এই কথা। সাহিত্য সমাজের এই সতর্কতাকে সম্মান করে না। সর্বকালের নীতির দিকে তাকিয়ে সাহিত্য অনেক সময় তাকে বিদ্রূপ করে তার বিরুদ্ধবাক্য ব'লে। অবশ্য সমাজের এমনও অনেক বিধি আছে যার আয়ু অল্প নয়। রীতির চেয়ে নীতির উপরে যার ভিত্তি। যেমন আমাদের হিন্দু-সমাজে গোহত্যা পাপ বলে গণ্য, অথচ সেই উপলক্ষে মানুষ-হত্যা ততদূর পাপ বলে মনে করি না। মুসলমানের অন্ন খেয়েছে বলে শাস্তি দিই, মুসলমানের সর্বনাশ করেছে বলে শাস্তি দিই নে। সমাজব্যবস্থার জন্য বাঁধাবাঁধি যে-নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু, যে-সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্মগত সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না, ইত্যাদি, সেগুলির ব্যতিক্রম কোনোকালে হতে পারে বলে মনে করি না।

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় : কিন্তু তরুণরা এই যে লিখেছেন, ভগবান প্রেম আর ভূত, মানি না, সাহিত্যে তার স্থান আছে কি।

রবীন্দ্রনাথ : এ কথা পূর্বে বলেছি। মানুষ যেখানে জয়ী হয়েছে সেখানে সে যা পেয়েছে তার বেশি দিয়েছে। ঐশ্বর্য বলতে এই বোঝায়, সে তার মূলধনের বাড়া। সেই

ঐশ্বর্যই প্রকাশ পায় সাহিত্যে। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঐশ্বর্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনায় উদ্‌বৃত্ত কিছু থাকে না। উদ্‌বৃত্তটাই নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়। লোভ-ক্রোধের প্রবলতার মধ্যেও প্রকাশের শক্তি আছে। যুদ্ধের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, নিষ্ঠুরতার মধ্যে আপনাকে সে প্রকাশ করতে পারে। বর্বরতার মধ্যেও সাহিত্যের প্রকাশযোগ্য কিছু আছে, সেটা কলুষ নয়, সেটা তেজ, শক্তি। অনেক সময় অতিসভ্য জাতির প্রাণশক্তিতে শৈথিল্য যখন আসে তখন বাহির হতে বর্বরতার ক্রোধ ও হিংসা কাজে লাগে। অতিসভ্য জাতির চিত্ত যখন ম্লান হয়ে আসে, চিরকালের জিনিস সে যখন কিছু দিতে পারে না, তখন তার দুর্গতি। গ্রীস যখন উন্নতির মধ্যগগনে ছিল তখন সে চিত্তেরই ঐশ্বর্য দিয়েছে, কামনা বা লালসার আভাস সেইসঙ্গে থাকলেও সেটা নগণ্য। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পঙ্কিলতা প্রকাশ পায় এও সেইরূপ। স্রোত ক্ষীণ হয়ে পাঁক বড়ো হলেই বিপদ।

একজন প্রশ্ন করলেন : আপনি সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শের কথা বললেন। সমালোচনারও এরকম কোনো আদর্শ আছে কি না। সাহিত্য-সমালোচনায় লগুড় ও ব্যক্তিগত গালাগালিই যদি একমাত্র জিনিস হয় তা হলে সেটা সাহিত্যের পক্ষে হিতজনক কি না।

রবীন্দ্রনাথ : এটা সাহিত্যিক নীতি-বিগর্হিত। যে-সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা- এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিক ভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময়ে টুকরো করতে গেলেই এক জিনিস আর হয়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে-ছবি আছে পটটাকে ছিঁড়ে তার বিচার করা চলে না– অন্তত সেটা আর্টের বিচার নয়। সুবিচার করতে হলে যে-শান্তি মানুষের থাকা উচিত সেটা রক্ষা করে আমরা যদি আমাদের মত প্রকাশ করি তা হলে সে মতের প্রভাব অনেক বেশি হয়। বিচারশক্তির প্রেস্‌টিজ শাসনশক্তির

প্রেস্‌টিজের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের গভর্মেন্টের কোনো কোনো ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে, তার মতে শাসনের প্রবলতা প্রমাণ করবার জন্যে মারের মাত্রাটা ন্যায়ের মাত্রার চেয়ে বাড়ানো ভালো। আমরা বলি, সুবিচার করবার ইচ্ছাটা দণ্ডবিধান করবার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।

সজনীকান্ত দাস : এখানে যে-আলোচনাটা হচ্ছে সেটা সম্ভবত “শনিবারের চিঠি’ নিয়েই?

রবীন্দ্রনাথ : হাঁ, “শনিবারের চিঠি’ নিয়েই কথা হচ্ছে।

ইহার পর “শনিবারের চিঠি’র আদর্শ, “শনিবারের চিঠি’র “মণিমুক্তা’র আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক ও সামাজিক ধষদঢ়ক্ষভশন, তাঁহারা যাহা সৃষ্টি করিতেছেন তাহা আদপে সাহিত্য কি না, ইত্যাদি বিষয়ে নানা ভাবের আলোচনা হয়। এই আলোচনায় শ্রী নিরদচন্দ্র চৌধুরী, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা পর পর লিখিত হইল।

মণিমুক্তা সম্বন্ধে

যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে সংগ্রহ ক’রে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে

যে-জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য।

এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ-সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হতে পারে না। যেমনতরো কোনোসময় বাতাস গরম হয়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না, এর পর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।

ঈশ্বরকে মানি নে, ভালোবাসা মানি নে, সুতরাং আমরা সাহিত্যে বিশেষ কৌলীন্য লাভ করেছি, এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। ঈশ্বরকে মানি না বা বিশ্বাস করি না, সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়। ভালোবাসা মানছি না, অতএব যারা ভালোবাসা মানে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্য প্রসঙ্গে এ কথা বলে লাভ কী।

“শনিবারের চিঠি’র সমালোচনা সম্বন্ধে

“শনিবারের চিঠি’ যদি সাহিত্যের সীমার মধ্যে থেকে বিশুদ্ধভাবে সম্পূর্ণভাবে সমালোচনার পথে অগ্রসর হন, তা হলে বেশি ফললাভ করবেন এই আমার বিশ্বাস। যদি একান্তভাবে দোষ নির্ণয় করবার দিকে সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করি তা হলে সেটা মাথায় চেপে যায়, তাতে শক্তির অপচয় ঘটে। “শনিবারের চিঠি’তে এমন-সব লোকের সম্বন্ধে আলোচনা দেখেছি যাঁরা সাহিত্যিক নন এবং জনগণের মধ্যেও যাঁদের বিশেষ প্রাধান্য নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে অতি প্রকট করে যে-সব ছবি আঁকা হয় তাতে না সাহিত্যের না সমাজের কোনো উপকার ঘটে। এর ফল হয় এই যে, যেখানে সাধারণের হিতের প্রতি লক্ষ্য করে লেখকেরা কঠিন কথা বলেন তার দাম কমে যায়। মনে হয়, কঠিন কথা বলাতেই লেখকের বিশেষ আনন্দ, তাঁর লক্ষ্য যেই হোক আর যাই হোক।

কর্তব্যপালনের যে অবশ্যম্ভাবী কঠোরতা আছে নিজেরও সম্বন্ধে সেটাকে অত্যন্ত দৃঢ় রাখা চাই। “শনিবারের চিঠি’র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনানৈপুণ্যেরও আমি

প্রশংসা করি, কিন্তুএই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশি; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ করবার উপলক্ষে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পেলে তবেই তাঁদের শৌর্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্যসংস্কার কার্যে তাঁদের কর্তব্যের ক্ষেত্র আছে – কিন্তু কর্তব্যটি অপ্রিয় বলেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদেরকে একান্তভাবে রক্ষা করতে হবে। অস্ত্রচিকিৎসায় অস্ত্রচালনার সতর্কতা অত্যন্ত বেশি দরকার, কেননা আরোগ্যবিধানই এর লক্ষ্য, মারা এর লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের চিকিৎসাই "শনিবারের চিঠি'র লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটুমাত্র বাইরে গেলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে অস্ত্রচালনার কৌশলই একমাত্র জিনিস নয়। প্রতিপত্তিও মহামূল্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা করে "শনিবারের চিঠি' যদি কর্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাকে কেউ নিন্দা করতে পারবে না। যাঁদের শক্তি আছে তাঁদের কাছেই আমরা যথাস্থানে ক্ষান্তি দাবি করি। কর্তব্য যেখানে বড়ো সেখানেই তার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ শুচি রক্ষার প্রয়োজন।

আধুনিক সাহিত্যের doctrine সম্বন্ধে পুনরায়

কেবলমাত্র না-মানার দ্বারা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। শুধু ভগবান প্রেম আর ভূত কেন তোমরা আরো অনেক কিছু না মানতে পার। যেমন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে যদি সে কথাও লিখতে তা হলে বুঝতেম সেটাতে সাহিত্য-বহির্বর্তী বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে। সাহিত্য-আলোচনায় যদি বল, অনেকে বলে ভীমনাগের সন্দেশ ভালো, আমি বলি ভালো নয়, তার দ্বারা সাহিত্যিক সাহসিকতা বা অপূর্বতার প্রমাণ হয় না।

সর্বশেষে

অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কেউ লিখতে পারে না। তোমরা বলতে পার, দরিদ্রের মনোবৃত্তি আমি বুঝি না, এ কথা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। তোমরা যদি বল, তোমাদের সাহিত্যের বিশেষত্ব দারিদ্র্যের অনুভূতি, আমি বলব সেটা গৌণ। তোমরা যদি

সর্বদা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে “দরিদ্রনারায়ণ’ “দরিদ্রনারায়ণ’ কর তাতে ক’রে এমন একটা বায়ুবৃদ্ধি হবে যাতে সাধারণ পাঠকেরা দরিদ্রনারায়ণ বললেই চোখের জলে ভেসে যাবে। তোমরা কথায় কথায় আধুনিক মাসিকপত্রে বল, আমরা আধুনিক কালের লোক, অতএব গরিবের জন্যে কাঁদব। এরকম ভঙ্গিমাবিস্তারের প্রশ্রয় সাহিত্যে অপকার করে। আমরা অর্থশাস্ত্র শেখবার জন্য গল্প পড়ি না। গল্পের জন্য গল্প পড়ি। “গরিবিয়ানা’ “দরিদ্রিয়ানা’কে সাহিত্যের অলংকার করে তুলো না। ভঙ্গি মাত্রেরই অসুবিধা এই যে, অতি সহজেই তার অনুকরণ করা যায়– অল্পবুদ্ধি লেখকের সেটা আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। যখন তোমাদের লেখা পড়ব তখন এই বলে পড়ব না যে, এইবার গরিবের কথা পড়া যাক। গোড়ার থেকে ছাপ মেরে চিহ্নিত করে তোমরা নিজেদের দাম কমিয়ে দাও। দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না। প্রত্যেকের নিজের ভিতর অভিমান থাকা উচিত যে, আমি যা লিখছি “গরিবিয়ানা’ বা “যুগ’ প্রচার করবার জন্য নয়, একমাত্র আমি যেটা বলতে পারি সেটাই আমি লিখছি। এ কথা বললেই লেখক যথার্থ সাহিত্যিকের আসন পায়। উপসংহারে এ কথাও আমি বলে রাখতে চাই, তোমাদের অনেক লেখকের মধ্যে আমি প্রতিভার লক্ষণ দেখেছি। আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্তনের লোভে প’ড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উল্‌কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে না মনে করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক।

১: বাংলার কথা। ৬ চৈত্র, সোমবার, ১৩৩৪

১৩৩৫

সাহিত্যসম্মিলন

যখন আমরা কোনো সত্যবস্তুকে পাই তাহাকে রক্ষণপালনের জন্য বাহির হইতে উপরোধ বা উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কোলের ছেলে মানুষ করিবার জন্য মাতাকে গুরুর মন্ত্র বা স্মৃতিসংহিতার অনুশাসন গ্রহণ করিতে বলা অনাবশ্যক।

বাঙালি একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ব স্বতই বাঙালির চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। এইরূপ একটি সাধারণ প্রীতির সামগ্রী সমগ্র জাতিকে যেরূপ স্বাভাবিক ঐক্য দেয় এমন আর কিছুই না। স্বদেশে বিদেশে আজ যেখানে বাঙালি আছে সেখানেই বাংলাসাহিত্যকে উপলক্ষ করিয়া যে সম্মিলন ঘটিতেছে, তাহার মতো অকৃত্রিম আনন্দকর ব্যাপার আর কী আছে।

ভিক্ষা করিয়া যাহা আমরা পাই তাহা আমাদের আপন নহে, উপার্জন করিয়া যাহা পাই তাহাতেও আংশিক অধিকার; নিজের শক্তিতে যাহা আমরা সৃষ্টি করি, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের আত্মপ্রকাশ, তাহার 'পরেই আমাদের পূর্ণ অধিকার। যে-দেশে আমাদের জন্ম সেই দেশে যদি সর্বত্র আমাদের আত্মা আপন বহুধা শক্তিকে নানা বিভাগে নানারূপে সৃষ্টিকার্যে প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে দেশকে ভালোবাসিবার পরামর্শ এত উচ্চস্বরে এবং এমন নিষ্ফলভাবে দিতে হইত না। দেশে আমরা আত্মপ্রকাশ করি না বলিয়াই দেশকে আমরা অকৃত্রিম আনন্দে আপন বলিয়া জানি না।

বাংলাসাহিত্য আমাদের সৃষ্টি। এমন-কি, ইহা আমাদের নূতন সৃষ্টি বলিলেও হয়। অর্থাৎ, ইহা আমাদের দেশের পুরাতন সাহিত্যের অনুবৃত্তি নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ধারা যে-খাতে বহিত বর্তমান সাহিত্য সেই খাতে বহে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ আচার-বিচার পুরাতনের নির্জীব পুনরাবৃত্তি। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহার অসংগতির সীমা নাই। এইজন্য তাহার অধিকাংশই আমাদিগকে পদে পদে পরাভবের

দিকে লইয়া যাইতেছে। কেবল আমাদের সাহিত্যই নূতন রূপ লইয়া নূতন প্রাণে নূতন কালের সঙ্গে আপনযোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত। এইজন্য বাঙালিকে তাহার সাহিত্যই যথার্থভাবে ভিতরের দিক হইতে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। যেখানে তাহার সমাজের আর-সমস্তই স্বাধীন পন্থার বিরোধী, যেখানে তাহার লোকাচার তাহাকে নির্বিচার অভ্যাসের দাসত্বপাশে অচল করিয়া বাঁধিয়াছে, সেখানে তাহার সাহিত্যই তাহার মনকে মুক্তি দিবার একমাত্র শক্তি। বাহিরে যখন সে জড়পুত্তলীর মতো হাজার বৎসরের দড়ির টানে বাঁধা কায়দায় চলাফেরা করিতেছে, সেখানে কেবল সাহিত্যেই তাহার মন বেপরোয়া হইয়া ভাবিতে পারে; সেখানে সাহিত্যেই অনেক সময়ে তাহার অগোচরেও জীবনসমস্যার নূতন নূতন সমাধান, প্রথার গণ্ডি পার হইয়া আপনিই প্রকাশ হইতেছে। এই অন্তরের মুক্তি একদা তাহাকে বাহিরেও মুক্তি দিবে। সেই মুক্তিই তাহার দেশের মুক্তির সত্যকার ভিত্তি। চিত্তের মধ্যে যে-মানুষ বন্দী বাহিরের কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা সে কখনোই মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের নব সাহিত্য সকল দিক হইতে আমাদের মনের নাগপাশবন্ধন মোচন করুক; জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে শক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সাহস দিক; তাহা হইলেই একদা কর্মের ক্ষেত্রেও সে সত্যের বলে স্বাধীন হইতে পারিবে। ইন্ধনের নিজের মধ্যে আগুন প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়াই বাহিরের আগুনের স্পর্শে সে জ্বলিয়া উঠে; পাথরের উপর বাহির হইতে আগুন রাখিলে সে ক্ষণকালের জন্য তাতিয়া উঠে, কিন্তু সে জ্বলে না। বাংলাসাহিত্য বাঙালির মনের মধ্যে সেই ভিতরের আগুনকে সত্য করিয়া তুলিতেছে; ভিতরের দিক হইতে তাহার মনের দাসত্বের জাল ছেদন করিতেছে। একদিন যখন এই আগুন বাহিরের দিকে জ্বলিবে, তখন ঝড়ের ফুৎকারে সে নিবিবে না, বরং বাড়িয়া উঠিবে। এখনই বাংলাদেশে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি, বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের দিনে মত্ততার তাড়নায় বাঙালি যুবকেরা যদি-বা ব্যর্থতার পথেও গিয়া থাকে, তবু আগুন যদি ভারতবর্ষের কোথাও জ্বলিয়া থাকে সে বাংলাদেশে; কোথাও যদি দলে দলে দুঃসাহসিকেরা দারুণ দুঃখের পথে আত্মহননের দিকে আগ্রহের সহিত ছুটিয়া গিয়া থাকে সে বাংলাদেশে। ইহার অন্যান্য যে-কোনো কারণ থাক্, একটা প্রধান কারণ এই যে, বাঙালির অন্তরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য অনেক দিন হইতে অগ্নি-সঞ্চয় করিতেছে– তাহার

চিত্তের ভিতরে চিন্তার সাহস আনিয়াছে, তাই কর্মের মধ্যে তাহার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালিই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, ভোজনপঙ্‌ক্তির বন্ধনচ্ছেদন, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বাধামোচন প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালিই সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশি করিয়া আপন ধর্মবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্যকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছে। তাহার চিন্তার জ্যোতির্ময় বাহন সাহিত্যই সর্বদা তাহাকে বল দিয়াছে। সে যদি একমাত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়াই আবহমান কাল সুর করিয়া পড়িয়া যাইত– মনের উদার সঞ্চরণের জন্য যদি তাহার মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলো, মুক্ত ক্ষেত্র না থাকিত– তবে তাহার মনের অসাড়তাই তাহার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল বেড়ি হইয়া তাহাকে চিন্তায় ও কর্মে সমান অচল করিয়া রাখিত।

মনে আছে, আমাদের দেশের স্বাদেশিকতার একজন লোকপ্রসিদ্ধ নেতা একদা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাংলাসাহিত্য যে ভাবসম্পদে এমন বহুমূল্য হইয়া উঠিতেছে দেশের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই কারণে বাঙালির মমত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে– সাধারণ দেশহিতের উদ্দেশেও বাঙালি এই কারণে নিজের ভাষাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারতের ঐক্যসাধনের উপায়স্বরূপে অন্য কোনো ভাষাকে আপন ভাষার পরিবর্তে বাঙালির গ্রহণ করা উচিত ছিল। দেশের ঐক্য ও মুক্তিকে যাঁহারা বাহিরের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা এমনি করিয়াই ভাবেন। তাঁহারা এমনও মনে করিতে পারিতেন যে, দেশের সকল লোকের বিভিন্ন দেহগুলিকে কোনো মন্ত্রবলে একটিমাত্র প্রকাণ্ড দৈত্যদেহ করিয়া তুলিলে আমাদের ঐক্য পাকা হইবে, আমাদের শক্তির বিক্ষেপ ঘটিবে না। শ্যামদেশের জোড়া যমজ যে দৈহিক শক্তির স্বাধীন প্রয়োগে আমাদের চেয়ে জোর বেশি পায় নাই, সে কথা বলা বাহুল্য। নিজের দেহকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দিতে পারিলেই তবে অন্য দেহধারীর সঙ্গে আমাদের যোগ একটা বন্ধন হইয়া উঠে না। বাংলাভাষাকে নির্বাসিত করিয়া অন্য যে-কোনো ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি-না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্বল করা হইবে। সেই দুর্বলতাই যে

আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। যেখানে আমাদের আত্মপ্রকাশ বাধাহীন সেখানেই আমাদের মুক্তি। বাঙালির চিত্তের আত্মপ্রকাশ একমাত্র বাংলাভাষায়, এ কথা বলাই বাহুল্য। কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে সেই আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই-জাতীয় মূঢ়তা। বাংলাসাহিত্যের ভিতর দিয়া বাঙালির মন যতই বড়ো হইবে ভারতের অন্য জাতির সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ হইবে। আপনাকে ভালো করিয়া প্রকাশ করিতে না পারার দ্বারাই মনের পঙ্গুতা, মনের অপরিণতি ঘটে; যে-অঙ্গ ভালো করিয়া চালনা করিতে পারি না সেই অঙ্গই অসাড় হইয়া যায়।

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলাদেশের কয়েকজন মুসলমান বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়ের অধিক-সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কি। চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে। বস্তুতই খর্বতা ঘটে যদি জবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালি-মুসলমানের মাতৃভাষা হয়, তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্তমান বাংলাসাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলাভাষাতে তাঁহার মুসলমানি মালমশলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরো জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলাভাষার মধ্যে তো সেই উপাদানের কমতি নাই– তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই তো। যখন প্রতিদিন মেহন্নৎ করিয়া আমরা হয়রান হই, তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে। যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ৎ তাহার হিন্দুজমিদারের প্রতি আল্লার দোয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দুহৃদয় স্পর্শ করে

না। হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ঝগড়া করিয়া, যদি সত্যকে অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই ভালো হয়। বিষয়সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু ভাষাসাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকর প্রস্তাব কখনো চলে।

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানি বাংলা, কেতাবি বাংলা নয়। স্কটলণ্ডের চলতি ভাষাও তো কেতাবি ইংরেজি নয়, স্কটলণ্ড কেন, ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ইংরেজি নয়। কিন্তু, তা লইয়া তো শিক্ষাব্যবহারে কোনোদিন দলাদলির কথা শুনি নাই। সকল দেশেই সাহিত্যিক-ভাষার বিশিষ্টতা থাকেই। সেই বিশিষ্টতার নিয়মবন্ধন যদি ভাঙিয়া দেওয়া হয়, তবে হাজার হাজার গ্রাম্যতার উচ্ছৃঙ্খলতায় সাহিত্য খান্‌খান্‌ হইয়া পড়ে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশেও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে। কিন্তু, দুই তরফের কেহই এ কথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের অন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র আজও প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌স্‌কে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তার পরে পলিটিক্‌স্‌ সত্য হইতে পারে। খানকতক বেজোড় কাঠ লইয়া ঘোড়া দিয়া টানাইলেই যে কাঠ আপনি গাড়িরূপে ঐক্য লাভ করে, এ কথা ঠিক নহে! খুব একটা খড়্‌খড়ে ঝড়্‌ঝড়ে গাড়ি হইলেও সেটা গাড়ি হওয়া চাই। পলিটিক্‌স্‌ও সেইরকমের একটা যানবাহন। যেখানে সেটার জোয়ালে ছাপ্পরে চাকায় কোনোরকমের একটা সংগতি আছে সেখানে সেটা আমাদের ঘরের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দেয়, নইলে সওয়ারকে বহন না করিয়া সওয়ারের পক্ষে সে একটা বোঝা হইয়া উঠে।

বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত তবে গ্রীক্‌সাহিত্যে গ্রীক্‌দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান ছিলেন। তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর যে-বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক-বন্দনা, তাহাতে

কবির ঐহিক পারত্রিক কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নাই। একদা নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও মুসলমান আমলে আরবি ফারসি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের ফোঁটা ক্ষীণ বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রের মতো সেখানকার ভোজে কাহারো জাতি নষ্ট হয় না।

অতএব, সাহিত্যে বাংলাদেশে যে একটি বিপুল মিলনযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা মুসলমানেরও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন তাঁহাদের অন্তর্যামীই জানেন, তাঁহারা ধর্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন। কিন্তু, আশা করিতেছি, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কারণ, প্রথমেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের সাধনা একটি সত্যবস্তু পাইয়াছে; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসংগত। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনোই ইঁহাদের আক্রমণে পরাভূত হইবে না।

১৩৩৩